চেতনায় বালাকোট

[সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) স্মরণে
সম্মেলন ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বুকলেট]

বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

চেতনায় বালাকোট

[হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) স্মরণে
সম্মেলন-২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বুকলেট]

উপদেষ্টা সম্পাদক
রূহুল আমীন খান

সম্পাদক
আহমদ হাসান চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

চেতনায় বালাকোট
[হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) স্মরণে
সম্মেলন-২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বুকলেট]

উপদেষ্টা সম্পাদক
রূহুল আমীন খান

সম্পাদক
আহমদ হাসান চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশকাল
৬ মে, ২০২৫
৭ যিলকদ, ১৪৪৬
২৩ বৈশাখ, ১৪৩২

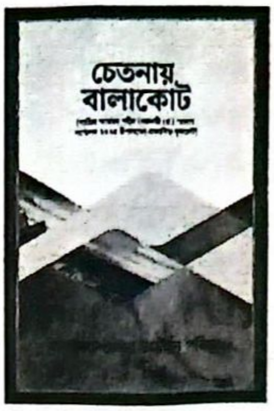
প্রকাশনায়
বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

স্পন্সর
আলহাজ্জ জসিম উদ্দিন
ট্রাস্টি, শাহজালাল জামে মসজিদ, কভেন্ট্রি, ইউকে
পরিচালক, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার, কভেন্ট্রি, ইউকে

হাদিয়াঃ ২০.০০ (বিশ টাকা মাত্র)

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

CHETONAY BALAKOT (Balakot in the spirit) [A Booklet published on the occasion of the Conference in memory of Hazrat Syed Ahmed Shaheed Baralvi (R.A.)-2025]. Advisory Editor: Ruhul Amin Khan, Editor: Ahmed Hasan Chowdhury, Assistant Editor: Mohammad Najmul Huda Khan. Sponsored By: Alhajj Joshim Uddin, Trustee, Shahjalal Jame Masjid, Coventry, UK & Director, Fultali Islamic Centre, Coventry, UK. Published By: Council for the Revival of Spirit of Balakot, Fultali Complex, Khilgaon, Dhaka-1219.



সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم– أما بعد

আযাদী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার, ঈমানী চেতনার প্রাণপুরুষ, আমীরুল মু'মিনীন, ইমামুত তরীকত, শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এ উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আযাদী আন্দোলন ও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির পাশাপাশি তিনি ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। এ উপমহাদেশে দ্বীনের প্রকৃত আকীদা-আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান অবিস্মরণীয়– জৌনপুর, ফুরফুরা, ফুলতলী, ছারছীনা, সোনাকান্দাসহ প্রায় সকল সিলসিলারই পূর্বপুরুষ হলেন তিনি। দেওবন্দী ধারার সর্বজনমান্য বুযুর্গ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর ঊর্ধ্বতন সিলসিলাও তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমাদের গৌরবের বিষয় হলো, আমরা তাঁরই সিলসিলার উত্তরসূরী। তাই তাঁর চিন্তা-চেতনা-আদর্শ সম্পর্কে আমাদের জানা, নতুন প্রজন্মকে জানানো এবং তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে দ্বীনের প্রকৃত খিদমাতে সকলকে উজ্জীবিত-অনুপ্রাণিত করা আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি।

এ লক্ষ্যে তাঁর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ কর্তৃক প্রত্যেক বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সম্মেলনে এ সিলসিলার অনুসারী খ্যাতনামা পীর-মাশায়িখ, আলিম-উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ-শিক্ষাবিদ অনেকে তাশরীফ এনে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ের অনুষ্ঠানে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যেহেতু খুব বেশি তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না সেহেতু আমরা শ্রোতা ও পাঠকবৃন্দের কথা বিবেচনা করে মাঝে মাঝে সম্মেলন স্মারক প্রকাশের চেষ্টা করে থাকি। এ বছর সময়ের স্বল্পতা স্বত্ত্বেও সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'চেতনায় বালাকোট' নামে একটি বুকলেট প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

বুকলেটে ফুলতলীর বড় ছাহেব মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী লিখিত জীবনগ্রন্থ "হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)" থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ ও ছারছীনার বর্তমান পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন সাহেবের একটি লেখার পাশাপাশি কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা এবং ২০১০ সালে গৃহীত ঘোষণাপত্র তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, এগুলো সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের খোরাক কিছুটা হলেও যোগাবে, ইন শা আল্লাহ।

বুকলেটটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদের উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন।

আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
সদস্য সচিব, বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

শহীদে বালাকোট

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

যুগ যুগ ধরে ভারত ভূমিতে ধর্মের নামে অধর্মের যে আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছিল তা দূর করে খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শের উপর হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথে বালাকোট প্রান্তরে শহীদ হয়ে অগণিত ভক্তের হৃদয়ে নবজীবন দান করলেন যিনি, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)।

শুভ জন্ম ও বংশ পরিচয়

সায়্যিদ আহমদ (র.) বেরেলীর বিখ্যাত হাসানী সায়্যিদ পরিবারে ৬ সফর, ১২০১ হিজরী মুতাবিক ২৯ নভেম্বর, ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

নসবনামা

সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইরফান বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ নূর বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ হুদা বিন সায়্যিদ আলামুল্লাহ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ফুদাইল বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ মুয়াযযাম বিন সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ মাহমুদ বিন সায়্যিদ আলাউদ্দীন বিন কুতবুদ্দীন ছানী বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছদর উদ্দীন বিন সায়্যিদ মুঈনুদ্দীন বিন সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ আলী বিন সায়্যিদ কিয়ামুদ্দীন বিন সায়্যিদ ছদরুদ্দীন বিন সায়্যিদ রুকনুদ্দীন বিন সায়্যিদ নিযামুদ্দীন বিন সায়্যিদ কুতবুদ্দীন বিন সায়্যিদ আহমদ মাদানী বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসূফ বিন সায়্যিদ ঈসা বিন সায়্যিদ হাসান বিন সায়্যিদ হুসাইন বিন সায়্যিদ জাফর বিন সায়্যিদ কাসিম বিন সায়্যিদ আব্দুল্লাহ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছানী বিন সায়্যিদ আব্দুল্লাহিল আশজার বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ ছাহেব নাফছে যাকিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিন আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবি তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

জনসেবায় কিশোর সায়্যিদ আহমদ (র.)

কৈশোরে পদার্পণ করলে সায়্যিদ সাহেবের হৃদয়ে এমন অস্বাভাবিক জনসেবার প্রেরণা জাগে যে বড় বড় সাধুপুরুষকেও তাঁর কাছে হার মানতে হয়। তিনি অনাথ, বিধবা ও দুর্বল প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিতেন

এবং তাদেরে জিজ্ঞেস করতেন, "পানি ও জ্বালানী কাষ্টের প্রয়োজন আছে কি?" প্রতিবেশীরা সায়্যিদ সাহেবের বাপ-দাদার মুরীদ ছিল। তারা উত্তরে বলত "কেন আমাদেরকে লজ্জা দিচ্ছেন, আমরাতো আপনাদের খাদিম।" সায়্যিদ সাহেব তাদের কথা শুনে খিদমত থেকে বিরত থাকতেন না বরং তাদেরকে খিদমতের ফদ্বীলত সম্পর্কে বুঝাতেন এবং সম্মত করে প্রয়োজন মিটাতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিজেকে মানুষের নগণ্য খাদিম মনে করতেন। বাজার থেকে সওদা কিনে দিতেন, পানিভর্তি কলসি মাথায় করে ঘরে পৌছে দিতেন, জঙ্গল থেকে জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করে নিজের চাদরে বোঝা বেঁধে মাথায় করে প্রতিবেশীর ঘরে পৌছে দিতেন।

আত্মভোলা কিশোর অন্যের সমালোচনায় কান না দিয়ে আপন মনে গরীব দুঃখীদের খিদমত করে যেতেন। তাঁর প্রশান্ত চাহনি দুঃখী জনের ব্যাথাভরা হৃদয়ে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করত। স্নেহমাখা মুখে দু'টি কচি অধর যেন নীরব ভাষায় ঘোষণা করতো গরীব অসহায় বন্ধুরা আমার! আমি তোমাদের কাছে দানের প্রতিদান চাই না, তোমাদের ধন্যবাদ পাওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই, আমি দয়াময়ের করুণাভিখারী, শেষ বিচারের জবাবদিহির ভয়ে শঙ্কিত।

এতীম, বিধবা ও দুর্বল প্রতিবেশীরা যেন তাদের হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলত হে কিশোর! তোমার জীবন ধন্য হোক; আমরা রিক্ত হস্ত, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান দিতে অপারগ। যিনি ধনী-দরিদ্র পথের কাঙাল সবারই মালিক তার দরবারে আমানত রইল তোমার জন্য দু'ফোটা আঁখিজল।

গোলাপ যেমন সৌরভ বিতরণে অপরকে আনন্দিত করেই নিজের জীবনকে স্বার্থক মনে করে, কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না সায়্যিদ আহমদ (র.)ও সেরূপ নিস্বার্থভাবে পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাহদের সম্পর্কে বলেছেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا–إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

তরজমা: এবং তারা আল্লাহর মুহাব্বাতে মিসকীন, এতীম ও কয়েদীকে খাদ্য দান করে (মনে মনে বলে) কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের খাদ্য দেই, তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান, ধন্যবাদ চাই না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসন্ন কঠোর ভয়াবহ নৈরাশ্যজনক কিয়ামতের দিনের জন্য শঙ্কিত। (সূরা দাহর, আয়াত ৮-৯)

তাই দেখা যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রকৃত উম্মতেরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের খিদমত করে গেছেন। সম্মান প্রতিপত্তি লাভের আশায়, অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবে যে দান করা হয় সে

দান মুসলমানী দান নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় পবিত্র হস্তে আসহাবে সুফফার সাহাবাগণের জীর্ণবস্ত্র পর্যন্ত সেলাই করে দিতেন।

বুকারটি ওয়াশিংটন, লেডি অব দ্যা ল্যাম্প, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ অমুসলমান মানব দরদীর কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যুগোপযোগী কার্যসূচির মাধ্যমে দুস্থ মানুষের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে না যাই। সারা জীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর খালি হাতে যেন মালিকের দরবারে না যাই। যতদিন বেঁচে আছি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ইবাদত-বন্দেগী

জনসেবার সাথে সাথে ইবাদতের প্রতিও সায়্যিদ সাহেবের গভীর আগ্রহ ছিল। দিনের বেলায় মানুষের খিদমতে মশগুল থাকতেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং এক একটি আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ত, কর্মকোলাহল মুখর ধরণী মৌন রূপ ধারণ করত তখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন আর খোদার দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন। হৃদয়ের দোয়ার খুলে দিয়ে একাগ্রমনে চিরজাগ্রত পরম বন্ধুর প্রেমের ধ্যান করতেন।

মুরশিদের দরবারে

সায়্যিদ আহমদ (র.) যখন প্রথম দিল্লিতে শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন শাহ সাহেব (র.) করমর্দন ও আলিঙ্গনের পর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার দেশ কোথায়? সায়্যিদ আহমদ (র.) উত্তরে বললেন, 'বেরেলী থেকে এসেছি'। বেরেলীর নাম শুনে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বেরেলীর কোন খান্দানের? সায়্যিদ সাহেব উত্তরে বললেন 'বেরেলীর সায়্যিদ বংশের'। সায়্যিদ বংশের কথা শুনে শাহ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন- বেরেলীর সায়্যিদ আবূ সাঈদ সাহেব ও সায়্যিদ আবূ নু'মান সাহেবকে চিনেন? সায়্যিদ সাহেব উত্তরে বললেন- সায়্যিদ আবূ সাঈদ সাহেব আমি অধমের নানা ও সায়্যিদ নুমান সাহেব আমার পিতৃব্য। সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর পরিচয় পেয়ে শাহ আব্দুল আযীয (র.) পুনর্বার দাঁড়িয়ে তার সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন, এত দূর দেশ থেকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে কি উদ্দেশ্যে আপনি দিল্লীতে এসেছেন? সায়্যিদ আহমদ (র.)

বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, আপনার অস্তিত্বকে দুর্লভ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা হৃদয়ে নিয়ে দূর বেরেলী থেকে ছুটে এসেছি আপনার দরবারে।

তখন শাহ আব্দুল আযীয (র.) সায়্যিদ সাহেবকে এই বলে বরণ করে নিলেন "খোদার ফযলে পিতামহ ও মাতামহের হাতের আমানত তোমার হাতেই ফিরে আসবে।" তারপর একজন খাদেমকে ডেকে বললেন, এই মেহমানকে ভাই মৌলভী আব্দুল কাদিরের কাছে পৌছে দিয়ে বলো, তিনি যেন এই সম্মানিত অতিথির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। মেহমানের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে পরে জানতে পারবেন।"

যাই হোক, সায়্যিদ সাহেব হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদির সাহেবের সাহচর্যে এক পবিত্র পরিবেশে দিন কাটাতে লাগলেন।

শাহ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১২২২ হিজরীতে সায়্যিদ আহমদ (র.) শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। প্রথম দিন কলব লতিফার তা'লীম আরম্ভ হয়। ২য় দিনে অন্য পাঁচ লতিফা খোলে যায়। তৃতীয় দিনে সুলতানুল আযকার স্তর অতিক্রম করেন। চতুর্থ বৈঠকে নফি ও ইসবাতের স্তর অতিক্রম করেন।

তারপর মুরশিদের হিদায়াত মতো বিভিন্ন রকমের মুরাকাবা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক স্তরে খোদার মেহেরবাণীতে অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করতে থাকেন।

বিলায়েতে আউলিয়া ও বিলায়েতে আম্বিয়া

কিছুদিন পর সায়্যিদ সাহেবের প্রিয় মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (র.) তাকে ডেকে বললেন, "খোদার মেহেরবাণীতে তুমি বিলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেছ।"

যারা বিলায়েতে আউলিয়া লাভ করেন তারা নির্জনতাকে পছন্দ করেন। রাতদিন যিক্‌র, তিলাওয়াত, নফল নামায ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকেন। ওয়ায নসীহতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আর যে সমস্ত সৌভাগ্যবান মানুষ বিলায়েতে আম্বিয়া লাভ করেন তাদের অন্তর আল্লাহর মুহাব্বতে ভরপুর থাকে। তারা মানুষকে সৎপথে আহবান করেন। দুনিয়াদার ও সমালোচকদের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাওহীদ ও সুন্নাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন। মানুষের হিদায়েতের জন্য ওয়ায মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বের বিস্ময় ছিলেন এই দরবেশ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ বেরলবী (র.)'র আধ্যাত্মিক রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। তিনি শুধু ভারতীয় মুসলমানদের কাছেই পরিচিতি নন বরং এই দরবেশ বৃটিশ সিংহের টনক

নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজেও তাঁর সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

WW Hunter মুসলমানদের মনে সায়্যিদ আহমদ (র.) সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'The Indian Musalmans' পুস্তক প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। হান্টার সাহেবের এই প্রচেষ্টায় বিস্মিত হবার কিছু নেই; দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর ধরে হান্টার সাহেবদের কলমে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের চিত্র বিকৃত করে আঁকা হয়ে আসছে। এ ধরণের বিকৃত চিত্রপ্রিয় এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোক শুধু সায়্যিদ আহমদ (র.) সম্পর্কেই নয়, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ, আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও ধাঁধায় পড়ে কাদা ছুড়েন। দয়াময়! তোমার মকবূল বান্দাহগণ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে যেন কোনো কু-ধারণা সৃষ্টি না হয়। আমীন।

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ

সায়্যিদ আহমদ (র.) এক রামাদ্বান মাসের একুশ তারিখে শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের খিদমতে আরয করলেন, "রামাদ্বান শরীফের তৃতীয়াংশের কোনো এক রাত্রে শবে কদরের ফদ্বীলত লাভের আশায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রাত জেগে ইবাদত করব।" শাহ সাহেব উত্তরে বললেন- বাবা! তোমার রাত্রি জাগরণের অভ্যাসমত এই দশ দিনও ইবাদত করো। কেবল জেগে থাকলেই কাজ হয় না। দেখো, কত চৌকিদার ও পুলিশ সারারাত জাগে কিন্তু তাঁরা এই দৌলত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। যদি তোমার অবস্থা আল্লাহ তাআলার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের অনুকূলে থাকে তবে তিনিই তোমাকে মহান রাতের বরকত দানের জন্য যথাসময়ে খবর দিবেন।

মুরশিদের আদেশমতো সায়্যিদ আহমদ (র.) শবে কদরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ২৭সে রামাদ্বানের রাত্রিতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইবাদত করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তমতো বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না, ইশার নামায শেষ করেই নিদ্রার তাড়নায় বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতের তৃতীয়াংশে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর ডান পাশে বসে আছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বাম পাশে বসে আছেন প্রিয়নবীর সুখ দুঃখের সাথী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। প্রিয় নবী আদর করে ডাকলেন হে আহমদ! জাগো। গোসল করো। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎক্ষণাৎ হাউযের ঠান্ডা পানিতে গোসল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে আমার প্রিয় ফরযন্দ! আজ শবে কদর, আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো, আল্লাহর কাছে মুনাজাত করো।" তারপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) এই রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন- আমি অধমের প্রতি এই মহামান্বিত রাত্রে খোদার অশেষ করুণা বর্ষিত হয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলাম পৃথিবীর সব কিছু খোদার উদ্দেশ্যে সিজদারত। সবই খোদার গুণগানে মশগুল। যদিও চর্মচক্ষে সবকিছু স্বস্থানে অবস্থিত মনে হচ্ছিল। আমি এই সময় আত্মিক উন্নতি লাভ করে, পূর্ণ বিলীন ও পূর্ণমগ্নতার ধ্যানে পরিপক্কতা লাভ করি। সায়্যিদ আহমদ (র.) ঘটনাটি আব্দুল আযীয (র.) কে শুনান। তিনি ঘটনাটি শুনে খুবই আনন্দিত হন এবং আমাকে বলেন, আল্লাহর শোকর; তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করেছ।

দ্বিতীয়বার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ

এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম স্নেহে তিনটি খুরমা মুখে তুলে দেন। পবিত্র খুরমা ভক্ষণের পর তাঁর হৃদয়ে যে অনুপম মধুর অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা স্বপ্ন ভঙ্গের পরও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

স্বপ্নে হযরত আলী (রা.)-এর দর্শন লাভ

সায়্যিদ আহমদ (র.) কিছুদিন পর হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে স্বপ্নে দেখেন। হযরত আলী (রা.) স্বহস্তে তাঁকে গোসল করান এবং ফাতিমা (রা.) তাঁকে এক প্রস্থ কাপড় দান করেন।

সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল

কিছুদিনের মধ্যে সায়্যিদ সাহেবের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ যেন তাঁর বান্দাহদের অন্তরের মোড় সায়্যিদ সাহেবের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নানা স্থান থেকে দাওয়াত আসতে লাগল। সায়্যিদ আহমদ (র.) তার মুরশিদের অনুমতি নিয়ে মানুষের হিদায়াতের জন্য ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। বিদায় বেলায় শাহ আব্দুল আযীয (র.) তাঁর প্রিয় খলীফা সায়্যিদ আহমদ (র.)-কে নিজের জামা দান করলেন।

সায়্যিদ আহমদ (র.) ১৮১৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী থেকে বের হন। তিনি বেরেলী পৌঁছা পর্যন্ত ছ'মাস সময়ের মধ্যে গাজীআবাদ, মুরাদনগর, মিরাঠ কান্দলাহ, বুদ্ধনা, মুজাফরনগর, দেওবন্দ, গংগু, নানুত, থানাবন, রামপুর, সাহারানপুর, শিকারপুর ও শেখপুরা ইত্যাদি স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন।

উল্লেখিত স্থানসমূহের হাজার হাজার লোক সায়্যিদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বহু লোক তাঁর হাতে বায়আত করে আবিদ শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। তিনি যেখানে সামান্য সময় অবস্থান করেন সেখানকার অনাবাদ মসজিদগুলি আবাদ হয়ে যায়, শিরক ও বিদআত দূর হয়ে যায়।

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া

হিন্দুস্থানে তখন তিনটি প্রসিদ্ধ তরীকা প্রচলিত ছিল। চিশতিয়া, কাদিরিয়া ও নকশবন্দিয়া। তাছাড়া নকশবন্দিয়া তরীকার একটি শাখাকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে মুজাদ্দিদিয়া বলা হতো। সায়্যিদ আহমদ (র.) উল্লেখিত তরীকাসমূহ ছাড়া মুহাম্মদী তরীকারও বায়আত নিতেন। এই সফরে রামপুরে অবস্থানকালে সায়্যিদ আহমদ (র.) কে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়। যেমন পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য বিবাহ করা, শরীআতসিদ্ধ নিয়মে অন্ন সংস্থানের জন্য বৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী হতে না দেওয়া, রাতের শেষদিকে তাহাজ্জুদ নামায ও ইবাদত করার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে নিদ্রা যাওয়া। এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার সার। অর্থাৎ চার তরীকা মুতাবিক যিকর, ফিকর ও মুরাকাবা করার সাথে সাথে জীবনের সকল কর্ম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মুতাবিক খালিস আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার উপর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাই তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার মূল উদ্দেশ্য।

জিহাদের প্রস্তুতি

সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তখন ইংরেজরা সমস্ত ভারত গ্রাস করছে। মোঘলের ধ্বংসাবশেষের উপর গজিয়ে উঠা রাজ্যগুলির পরিচালকদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। তারা নিজের আরাম-আয়েশকে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতির অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তারাও ইংরেজ অজগরের গ্রাসে পরিণত হতে চলেছে। শিখরা পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের চক্রান্তে অনেক এলাকার মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা লোপ পেয়েছে। জিহাদের সে উদ্যম আর তাঁদের হৃদয়ে নেই। টিপু সুলতান ও হায়দার আলীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর মতো একজন সাচ্চা মুজাহিদের নেতৃত্বে জিহাদের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি জিহাদ করবেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে, শিখদের বিরুদ্ধে।

বহুদিন থেকে সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর কাজটি আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল। এখন তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের মুরশিদ, যারা আল্লাহ ও রাসূলের দীনের জন্য

প্রাণ দিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। তিনি ভক্তদেরকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন।

সায়্যিদ সাহেবের দরবারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)

সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) বাংলা ও আসামের মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে বেরেলীতে সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং অল্পদিনের মধ্যে কামালিয়াত লাভ করেন।

হজ্জ

সায়্যিদ আহমদ (র.) ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, তিনি দলবলসহ কোন নিরাপদ স্থানে হিজরত করে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে ভারতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাকল্পে জিহাদ আরম্ভ করবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ কর্মসূচি পরিবর্তন করে ঘোষণা করলেন, হজ্জে যাবেন। হঠাৎ মত পরিবর্তন করার কারণ ছিল এই: অনেক উলামা নামধারী ব্যক্তি জলপথ নিরাপদ নয় বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, ভারতবাসীর উপর এখন হজ্জ করা ফরয নয়। সায়্যিদ সাহেবের মুরশিদ শাহ আব্দুল আযীয (র.) এই ফতওয়াকে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেন।

সায়্যিদ আহমদ (র.) ঠিক করলেন যে, তিনি দলবল সহ নিজে হজ্জে গেলে ভারতবাসী মুসলমানদের মন থেকে ফতওয়া দ্বারা সৃষ্ট ধারণাটি সহজে দূর হবে। তাই তিনি জিহাদ আরম্ভ করার আগে এই পবিত্র কাজটি সমাধান করতে বদ্ধপরিকর হলেন। স্বীয় শিষ্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, আমি এবারে হজ্জে যাব, যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে আসেন। হিন্দুস্থান জুড়ে সাড়া পড়ে গেল, রাসূলের আশিক বান্দারা জমা হতে লাগলেন।

১২৩৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদের নামাযের পর চারশত হজ্জ যাত্রীকে নিয়ে সায়্যিদ সাহেব তাকিয়া শরীফ থেকে রওয়ানা হন। তাঁর কাছে কয়েকটি টাকা ছিল। তিনি তা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। একমাত্র খোদার উপর ভরসা রেখে সমস্ত কাফেলাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন।

ষোলো মাইল পথ অতিক্রম করার পর কাফেলাকে নিয়ে ডলমুর অনতিদূরে এক বাগানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দু'জন অশ্বারোহী তীব্রবেগে বাগানের দিকে ছুটে আসছে। অশ্বারোহীদ্বয়ের পিছনে পিছনে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকও আসছে। তারা কাছে এসে থেমে গেলেন। সায়্যিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে বায়আত করলেন। তারপর অশ্বারোহীদ্বয়ের একজন সায়্যিদ সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন– আমরা দুই সহোদর, আমি জ্যেষ্ঠ। এ পথে আপনার আগমন সংবাদ জানতে পেরে

বেশ কয়েকদিন থেকে আপনার সমস্ত কাফেলাকে দাওয়াত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজ আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ করেছি এমন সময় আমার ছোট ভাই আড়ি পেতে বসল। সে আমার আগেই আপনার কাফেলাকে দাওয়াত করতে চায়। আমাদের মধ্যে এ নিয়ে বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে গেছে। মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভবপর হচ্ছে না। এখন আপনার আদেশ শিরোধার্য।

সায়্যিদ আহমদ (র.) উভয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঝগড়াটার ফয়সালা করে দিলেন। তারা সন্তুষ্টচিত্তে সায়্যিদ আহমদ সাহেবকে কাফেলাসহ ডলমুতে নিয়ে গেলেন। সায়্যিদ সাহেব এখানে সপ্তাহকাল অবস্থান করলেন।

এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সায়্যিদ সাহেবের শরণাগত শত শত ভক্ত প্রবরের আগমনে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সহস্রাধিক নর-নারী সায়্যিদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। স্থানে স্থানে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হলো। শহরে উলামায়ে কিরাম শিরক বিদআতের পরিণাম, তাওহীদের মাহাত্ম্য এবং হজ্জের ফদ্বীলত ইত্যাদি বিষয়ে ওয়ায করলেন। চতুর্দিকে ঘোষণা করা হলো পরের দিন ফজরের নামাযের পর সায়্যিদ সাহেব ওয়ায করবেন।

সায়্যিদ সাহেবের ওয়ায ও প্রতিক্রিয়া

মাওলানা ওয়াহীদ উদ্দীন সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিবেদন করলেন যে, আজ রুগ্ন ব্যক্তি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত। এখন চিকিৎসকের শুভ দৃষ্টির প্রয়োজন। সায়্যিদ সাহেব তখন আহসানুল খালিকীন অর্থাৎ চিরসুন্দর আল্লাহ তাআলার গুণাবলি বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তারপর আল্লাহ তাআলার কোন নিআমতের কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তা ব্যাখা করলেন। দৈহিক সৌন্দর্য, ধন দৌলতের কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতে হয় তাও উপস্থাপন করলেন। তারপর মৃত্যু, কবর, হাশর ইত্যাদির ভয়াবহতা এমনভাবে বর্ণনা করলেন যে উপস্থিত লোকেরা বেহুশ হয়ে গেলেন। কামরার অভ্যন্তর থেকে ওয়ায শুনে এক মেয়েলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সে পাগলিনীর মতো দরজা খুলে ছুটে এসে সায়্যিদ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে তাওবাহ ও বায়আত করল। তারপর মুন্সী সাহেবও বায়আত করলেন।

মেয়েলোকটি সায়্যিদ সাহেবকে উকিল নিয়োগ করে বললো– হুজুর যেকোনো নগণ্য বা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তির সাথে আমাকে শাদী দিতে পারেন। তখন সায়্যিদ সাহেব ঐ মাহফিলেই মুন্সী সাহেবের সাথে তাঁর শাদী দিলেন। শাদীর পর তিনি খোদাভীরু ও পরহেযগার হিসাবে সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

গোলাম হোসেনের পরিণতি

গোলাম হোসেন কলকাতার একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট নব্বই লাখ টাকা নগদ মওজুদ ছিল। দিবারাত্রি সে একটি নেশায়ই মশগুল

থাকত যে, কিভাবে আরো এক লাখ টাকা নগদ জমা করে কোটিপতি হবে। সে ছিল ব্যভিচারী ও শরাবী। সায়্যিদ সাহেবকে পরম শক্র মনে করত সে। তিনি মদ, অন্যায় কর্ম, নৃত্য, গীত নিষেধ করতেন। সে বলতো সায়্যিদ সাহেব যতো বেশি এসকল কর্ম নিষেধ করেন ততো বেশি আমার অন্তরের আকর্ষণ এসকল কর্মের প্রতি বেড়ে যায়। সায়্যিদ সাহেব এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন কিন্তু তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

একদিন আসরের নামায শেষ করে সায়্যিদ সাহেব ময়দানে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ মাথার টুপি খুলে বললেন, "আল্লাহর গযব গোলাম হোসেন দালালের উপর নাযিল হয়ে গেল"। পরে জানা গেল যে গোলাম হোসেন পাগল হয়ে গেছে। সে প্রায় সময়ই পাগল অবস্থায় অতিবাহিত করত। মাঝেমধ্যে হুশ ফিরে আসলে সে বলতো, সায়্যিদ সাহেবকে নিয়ে আস অথবা আমাকে সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিয়ে যাও। লোকেরা তখন তাকে সায়্যিদ সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ সে আরাম অনুভব করত। সায়্যিদ সাহেবের নিকট থেকে চলে গেলে আবার পাগল হয়ে যেত। এমতাবস্থায় সে তার পার্থিব ধন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।

গুজারিশ: আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার নেশায় মশগুল অনেক ব্যক্তি পথিমধ্যে আযরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। সম্পদ আহরণের নেশাটা অসীম অথচ মানুষের জীবন সসীম। মৃত্যু কোনো সময় আসে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এক মদ্যপায়ীর তাওবাহ

এক সম্পদশালী মুসলমান শরাবের প্রতি এতো অধিক আকৃষ্ট ছিল যে, দিনরাত সে শরাব পান করত। সায়্যিদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে একদিন বললো, "আমি আপনার নিকট তাওবাহ করে সব নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করব। তবে আমাকে শরাব পানের অনুমতি প্রদান করতে হবে। কেননা শরাব ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচাই মুশকিল। সায়্যিদ সাহেব বললেন, তাই হোক। শুধু আমার সামনে শরাব পান না করলেই হয়। সায়্যিদ সাহেবের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি আনন্দ চিত্তে তাওবাহ ও বায়আত করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘরে পৌঁছে যখন শরাবের নেশা অনুভব করল তখন খাদিমকে ডেকে বললেন, শরাবের পেয়ালাটা নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশমত শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে সামনে রাখলো। লোকটি শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিবে এমন সময় দেখলেন দাঁতে অঙ্গুলি চেপে সায়্যিদ আহমদ (র.) দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। তখনই তিনি দাঁড়ালেন এবং শরাব পান না করার প্রতিজ্ঞা করে পেয়ালা ফেলে দিলেন।

তারপর দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব ওখানে নাই। মনে মনে ভাবলেন হয়তো তাঁর চোখে ধাঁধাঁ লেগেছে। সায়্যিদ সাহেব তো ওখানে আসেননি।

তারপর আবার খাদিমকে ডেকে বললেন, এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশমত এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আসে। এবারো শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে উদ্যত হওয়া মাত্র দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পেয়ালাটি ফেলে দিলেন। সায়্যিদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব লাপাত্তা। অতঃপর একটি কামরায় এসে তিনি সব দরজা-জানালা বন্ধ করে শরাব তলব করেন। কিন্তু পেয়ালা হাতে তুলতেই দেখলেন, সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পেয়ালাটা ফেলে দিয়ে সায়্যিদ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পায়খানায় প্রবেশ করে শরাব পানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকেও দেখলেন যে সায়্যিদ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর লোকটি শরাব পান ত্যাগ করে তাওবাহ করেন।

সূরা ফাতিহার তাফসীর

সায়্যিদ আহমদ (র.) উন্নতি লাভ করলে শাহ আব্দুল আযীয (র.) স্বীয় মুরীদগণকে বলে দিয়েছিলেন, "এখন যা কিছু হবার সায়্যিদ সাহেবের দ্বারাই হবে"। ফলে শাহ আব্দুল আযীয (র.)-এর মুরীদগণের মধ্যে বহু বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গী হন। তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন সায়্যিদ নেছার আলী। তিনি সায়্যিদ সাহেবের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং কলকাতায় সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তখন কলকাতায় তিনজন স্বনামধন্য বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। একজনের নাম মৌলভী রশিদ, যিনি "হেদায়া" কিতাব ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ২য় জনের নাম মৌলভী মোয়াজ্জম হোসেন। ৩য় জনের নাম বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, কোনো এক সময়ে সায়্যিদ সাহেবের নিকট কেবলমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম, অন্য কেউ ছিল না। এমন সময় বর্ণিত তিন আলিম সায়্যিদ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে সায়্যিদ সাহেবের বিদ্যা পরখ করার উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহার তাফসীর জিজ্ঞাসা করেন। তখন সায়্যিদ সাহেব সূরা ফাতিহার তাফসীর এমন সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করলেন যে, উপরোক্ত তিন জন আলিম তা শ্রবণ করে বিস্মিত হন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সায়্যিদ সাহেবের হাতে বায়আত করেন।

হিন্দু শেঠের ইসলাম গ্রহণ

জাফর থানেশ্বরী (র.) তৎপ্রণীত হায়াতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে এবং মাখযানে আহমদী প্রণেতা নবাব অজিরুদ্দৌলা নিম্নলিখিত ঘটনা তদীয় পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি এই: বাংলাদেশের সিলেট শহরে বিরাট ঐশ্বর্যশালী এক হিন্দু বসবাস করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে একটি সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিড়ি বেয়ে তিনি প্রথম আসমানে উপস্থিত হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন উত্তম পোষাক পরে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন লোক আসনে উপবিষ্ট। তাকে সালাম করে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সম্মানিত নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি বনি আদমের পিতা "আদম"। স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি বলেন, আমি বাম পাশে একটি দরজা দেখলাম যে দরজার অভ্যন্তরে কান্নাকাটির চিৎকার শুনলাম। দরজা দিয়ে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলাম অভ্যন্তর ভাগে আগুনের লেলিহান শিখা ও মেঘমালার মতো ধোঁয়া স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের কান্না-কাটি ও আর্তনাদের রোল উঠেছে। অভ্যন্তর ভাগে বিকট দুর্গন্ধ, যা অসহনীয়। অবস্থা দর্শনে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম। আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমাকে ডান পার্শ্বের দরজার নিকটে নিয়ে যান। নির্দেশ মোতাবেক তিনি আমাকে ডান পার্শ্বের দরজার সম্মুখে নিয়ে গেলেন। উক্ত দরজা দিয়ে প্রবাহিত সুগন্ধি বাতাসের প্রভাবে আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম অভ্যন্তরভাগে রয়েছে লাল জওহর মৃতি নির্মিত দালানসমূহ। ফলে ফুলে সুশোভিত সবুজ বৃক্ষরাজি। স্বচ্ছ জলের নানাবিধ প্রস্রবণ প্রবাহিত। আমি আনন্দচিত্তে কুর্সীতে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়ে উভয় স্থান সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ডান দিকে একত্ববাদী মুমিনদের অবস্থান স্থল এবং বাম দিকে যারা আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে মূর্তিপূজা করে সে সকল কাফির ও মুশরিকদের কয়েদখানা। তুমি তাদের দলভুক্ত। যদি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো তবে তোমার ঠিকানাও দুযখে হবে, যে দুযখ তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করলে। যেহেতু এখনও তোমার মৃত্যুর সময় আসেনি তাই ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পূর্বে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবাহ করে সে বেহেশতটিকে তোমার ঠিকানা করে নিতে পার, যা তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করলে। উভয় স্থানের ব্যাখা প্রদানের পর কুর্সিতে উপবিষ্ট ব্যক্তি (আদম আ.) বললেন আল্লাহর তরফ থেকে একজন হিদায়াত প্রদানকারী, যিনি বর্তমানে হজ্জের পথে কলিকাতায় অবস্থান করছেন, কিছুদিনের মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করে হজ্জে চলে যাবেন, তুমি তার নিকট পৌঁছে তাওবাহ করে ইসলাম গ্রহণ করো।

উক্ত হিন্দু শেঠ স্বপভঙ্গের পর মেইল গাড়িতে আরোহন করে সিলেট থেকে কলিকাতায় পৌঁছে সায়্যিদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। সায়্যিদ সাহেব তার সমস্ত ঘটনা ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সায়্যিদ আহমদ সাহেব হিন্দু শেঠকে খত্না করানোর ব্যবস্থা করেন। সুস্থ হয়ে বায়আত করে ঐ ব্যক্তি তার বাড়িতে ফিরে আসেন।

কলিকাতায় বায়আত গ্রহণ

কলিকাতায় তিন মাস সময় সায়্যিদ আহমদ (র.) অবস্থান করেন। সেখানে বায়াত করার জন্য এত বেশি লোকের ভীড় জমে যে পাঁচশত থেকে হাজার পর্যন্ত লোককে একস্থানে সমবেত করে সাত আটটি পাগড়ি ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন যেন বায়আতকারীগণ যে কোনো পাগড়ীর কিনার ধরে। অতঃপর বায়আতের বাক্যগুলি উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। এভাবে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বায়আত চলত।

শরাবের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেল

কলকাতায় শরাব বিক্রয়ের দোকানগুলোতে আকস্মিকভাবে শরাব কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারী ট্যাক্স যুগিয়ে যাচ্ছি। কেননা একজন বুযুর্গ বিরাট কাফেলাসহ এই শহরের বুকে পদার্পনের ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের সকল মুসলমান তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তাওবাহ করেছে। এখন কেউ আর আমাদের দোকানের কোলও ঘেষে না।

অতএব, সরকারী হুকুমনামা বের হলো যে, যতদিন পর্যন্ত সায়্যিদ সাহেব এবং তার দলবল কলকাতায় অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত সরকারী ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। তাঁর বিদায় নেওয়ার পর যদি সাবেক অবস্থার পুণর্বহাল হয় এবং শরাবের ক্রয়-বিক্রয় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তবে কর পুনরায় ধার্য করা হবে।

নও মুসলিমদের খতনা

ইসলামে নব দীক্ষিত লোকের সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে তাদের খত্না করার পর যে বিরাট ঘরে তারা অবস্থান করত সেখানে সুশ্রুষার জন্য দশ, পনের জন লোকের সব সময় প্রয়োজন হতো।

হাজার হাজার মুসলমান এমনও ছিল যাদের ঘরে বিবাহ ছাড়া অবৈধভাবে অনেক মেয়েলোক ছিল। এমনও অনেক মুসলমান ছিল যারা বাল্য বয়সে খতনা দেয়নি। যারা বায়আত করতেন তাদেরকে বিবাহ ও খতনা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। যারা খতনা দেয়নি তাদের খত্না দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং অবৈধভাবে আশ্রিত মেয়েদের সাথে ইসলামী বিধান মতো বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

হান্টারের উক্তি

বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুসলিম শক্তিকে কিভাবে নিস্তেজ ও

নির্মুল করা যায় এ বিষয়ে গবেষণাকারীগণের মধ্যে ডবিউ ডবিউ হান্টারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি সায়্যিদ আহমদ (র.) কে অন্যায়ভাবে ওয়াহাবী বলে অখ্যায়িত করে ভারতীয় মুসলমানদের সরলমন বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন এবং সায়্যিদ আহমদ (র.) কে দস্যু ও শহীদ তিতুমীরকে গুন্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রণীত "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান" পুস্তক থেকে (তার অভদ্র ভাষায়) প্রয়োজনীয় কিছু উক্তি পেশ করলাম।

''পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সায়্যিদ আহমদ। অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিন্ডড়রী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়েকজন তেজস্বী পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সায়্যিদ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম...........।"

"দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সে দিল্লিতে চলে যায় মুসলমানী আইনের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তিন বৎসর সেখানে শিক্ষানবিশীর পর সে নিজেই একজন প্রচারক হিসাবে কাজ শুরু করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এ ধর্মীয় নেতা ধীরে ধীরে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ শিষ্যরা এই ভ্রমণকালে তার সেবা যত্ন করতে থাকে। সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান লোকেরা পর্যন্ত সাধারণ ভৃত্যের মত নগ্নপদে তার পালকীর পাশে পাশে দৌড়ে অগ্রসর হয়। পাটনার দীর্ঘ যাত্রা বিরতিকালে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রীতিমত একটা সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাত্রা পথে অবস্থিত বড় বড় শহরে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আদায়ের জন্য সে প্রতিনিধি নিয়োগ করে কাফেলার আগে তাদের পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি সে মুসলমান সম্রাটদের মতো প্রাদেশিক গর্ভনর নিয়োগ করে। এভাবে পাটনায় একটি স্থায়ী আস্তানা স্থাপনের পর সে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গঙ্গার গতি পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় সে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং পথিপার্শ্বের সমস্ত বড় বড় শহরে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে। কলকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোক তার কাছে সমবেত হয় যে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে মুসাফাহা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মাথার পাগড়ি খুলে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে, পাগড়ির যে কোনো অংশ স্পর্শ করলেই সে ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব লাভ করবে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সে হজ্জ করতে মক্কা গমন করে। এইভাবে হজ্জের পবিত্র আবরণে সে তার প্রাক্তন দস্যু চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে পরবর্তী বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই হয়ে ফিরে আসে। বোম্বাই শহরেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে সে কলকাতার মতো বিরাট সাফল্য অর্জন করে।" ('দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' পৃষ্ঠা-৫)

কলিকাতায় অবস্থান

পূর্ণ তিন মাসকাল সায়্যিদ সাহেব কলকাতায় অবস্থান করেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে এগারটি জাহাজ ভাড়া করেন। প্রত্যেক জাহাজে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। দরিয়া বাক্কা জাহাজের নাবিক ছিলেন হাদারামাউত নিবাসী সায়্যিদ আব্দুর রহমান। জাহাজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুরত নিবাসী শেখ দাউদ। উক্ত জাহাজে সায়্যিদ আহমদ (র.) নিকট সম্পর্কিত লোকসহ আরোহণ করেন।

জাহাজে মীলাদ শরীফ

জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে অস্বাভাবিক উত্তাল তরঙ্গমালায় দুলতে লাগল। সায়্যিদ আহমদ (র.) সকলকে এক স্থানে সমবেত করে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ আরম্ভ করলেন। সকলে আমীন বলতে লাগলেন। দুআর ফলে সকলে এমনি অভিভূত হলেন যে, দুআ গ্রহণযোগ্য বলে অন্তরে সাড়া পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজের অনুকূলে বাতাস প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো। উত্তাল তরঙ্গমালা শান্ত ভাব ধারণ করলো। জাহাজ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। রাত্রিকালে শ্রীলংকার নিকট জাহাজ পৌঁছলে সায়্যিদ সাহেব সমস্ত রাত্রি পাহারাদারের মতো কখনো উপরে কখনো নিচে আনাগোনা করতে লাগলেন। এর কারণ সম্পর্কে পরে তিনি বলেন, ভয়ঙ্কর দৈত্য ও শয়তানের দল (ইফরিত) আমাদের ছোট্ট কাফেলার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দেন। প্রভাতে জাহাজ বিপদজনক ঘাটি অতিক্রম করলো। জাহাজের নাবিক শিরনির আয়োজন করলেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) মীলাদ মহফিলের আয়োজন করলেন। মীলাদ শরীফে আরবী কাসীদা আবৃত্তি করা হলো। অতঃপর শিরণী বিতরণ করা হলো।

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সায়্যিদ আহমদ (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্ছা আশিক ছিলেন। তিনি বালাকোট প্রান্তরে শাহাদত বরণ পর্যন্ত বারে বারে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার স্বপ্নযোগে লাভ করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনায় সদা-সর্বদা পঞ্চমুখ থাকতেন, দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং মীলাদ শরীফ পড়তেন। সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) স্বীয় মুরীদগণকে মীলাদ পাঠে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে 'আল-মুলাখখাস' কিতাব প্রণয়ন করেন। উক্ত কিতাবে মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে সুদৃঢ় দালীলিক প্রমাণ পেশ করেছেন। সৌদি হুকুমতের পূর্বে যারা হারামাইন শরীফাইনের ইমাম ছিলেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ইমামগণ মীলাদ শরীফের সপক্ষে যে ফতওয়া দিয়েছেন, তাও উদ্ধৃত করেছেন।

কুদরতী মিষ্ট পানি

সমুদ্র পথে কোনো এক স্থানে পৌঁছলে জাহাজের নাবিক সংবাদ দেন যে মিষ্ট পানি শেষ হয়ে গেছে। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎক্ষনাৎ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ আরম্ভ করলেন। দুআরত অবস্থায় তার নিকট ইলহাম হয় যে, এখানকার লোনা পানি মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন উঠিয়ে নাও। উক্ত শুভ সংবাদ শুনামাত্র জাহাজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ্ করেন। সেই পানি ছিল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

গায়বী সাহায্য

এডেন বন্দরে পৌঁছলে সায়্যিদ আহমদ (র.) কয়েকজন সঙ্গীসহ জাহাজ থেকে অবতরণ করে নৌকায় আরোহন করেন। সমুদ্র তীরে পৌঁছে অবগত হন যে, বন্দর থেকে শহর অনেক দূরে। অত্যাধিক গরমের মধ্যে পথ অতিক্রম করা ছিল দুরূহ ব্যাপার অথচ সেখানে কোনো যানবাহন বা সওয়ারী ছিল না। অধিকন্তু অনেকের পায়ে জুতাও ছিল না। সওয়ারীর অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে, সামনের পাহাড়ে ভাড়াটে উট পাওয়া যেতে পারে। এদিকে এত অধিক গরমে পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে উট নিয়ে আসা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তখন সকলেই অপারগ অবস্থায় সায়্যিদ সাহেবের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিকট প্রয়োজনীয় সব কিছু পৌছিয়ে দিবেন। চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে প্রত্যেককে সাতবার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবিক সকলেই সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলেন। সাতবার পাঠ করার পূর্বেই দেখা গেল পাহাড়ের দিক থেকে কয়েকটি উট ছুটে আসছে। তারা কাফেলার নিকট এসে থামল। সোজা তারা সায়্যিদ সাহেবের নিকট পৌছল। তারা উটগুলিতে আরোহন করে এডেন শহরে পৌছলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার গন্তব্যস্থলে পৌছার পর দেখলেন উটচালকসহ উটগুলি গায়েব হয়ে গেল। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া গেল না।

পরিশেষে তারা উক্ত শহরের কাজীর নিকট পারিশ্রমিকের টাকা জমা রাখতে চাইলেন। কাজী উত্তর দিলেন আপনারা উট ও উষ্ট্র চালকের যে বর্ণনা দিলেন এমন কোনো উট ও উষ্ট্র চালক এ শহরে নেই। এখন টাকা নিয়ে আমরা কার হাতে দিব, এ ছিল গায়বী সাহায্য।

[লেখক: শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা, বরেণ্য শায়খুল হাদীস ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।]

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)

আমাদের চেতনার বাতিঘর

মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

-আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য প্রতি একশত বছরের শুরুতে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মাতের জন্য দ্বীনকে সংস্কার করবেন। (আবু দাউদ: ৪২৯১)

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ছিলেন তেমনই একজন মুজাদ্দিদ। তাঁর আবির্ভাবের ফলে ইসলামের যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা আজও চলমান। তাঁর জীবনকাল ও জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই- তিনি সোনালী যুগের সেইসব মানুষের প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন, যারা রাতভর আল্লাহর ইবাদতকারী ছিলেন আবার দিনে ছিলেন ময়দানের দুঃসাহসী মুজাহিদ।

নিছক সামরিক শক্তি দিয়ে কিংবা রাজনীতি করে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, ইসলামী সমাজ ও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়া। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) ছিলেন তেমনই এক আধ্যাত্মপুরুষ, যার পরশমণিতুল্য সংস্পর্শে সুফি মুজাহিদরা ইসলামী খিলাফত গড়ে তুলেছিলেন, শরীআহ আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁরা এত বেশি ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিলেন যে, সংখ্যায় মাত্র ৭০০ জন হয়েও রণজিৎ সিংয়ের ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর মিশন ও কর্মধারা মূলত তিনভাগে বিভক্ত ছিল:

১. তাজদীদী কার্যক্রম তথা দ্বীনী সংস্কার: একজন মুজাদ্দিদের প্রধান কাজ দ্বীনে ইসলামের প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনার জন্য শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর হাতে এ কাজ পূর্ণতা লাভ করেছিল। সে সময় অনেক মুসলমানের অবস্থা এমন ছিল যে,

মুসলমান হলেও খতনা করতো না, মদ্যপান করতো, হিন্দুয়ানী বেশভূষা গ্রহণ করতো, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক রাখতো, হজ্জসহ বিভিন্ন ফরজ আমল অস্বীকার নয়তো অবহেলা করতো। তাঁর বিপুল তাজদীদী খিদমতের ফলে মানুষের মাঝে প্রকৃত ইসলামের চেতনা ফিরে আসে। এমনকি অবস্থা এমন হয়েছিল, যতদিন তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন, মদ্যশালাগুলোতে মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়।

২. তরীকতের চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনা: সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তরীকতে অত্যন্ত উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মুহাম্মদিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকা চিশতিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার সার নির্যাস। এই তরীকার মধ্য দিয়ে উক্ত তরীকাগুলোর ফায়য-বরকতের ধারা অবিরল ধারায় প্রবাহমান।

৩. দ্বীন রক্ষার জন্য জিহাদ: ইসলামকে প্রতিষ্ঠা ও শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় জিহাদের কোনো বিকল্প নেই। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তিনি ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন। এমন সাফল্য সমকালীন বিশ্বে আর কেউ দেখাতে পারেনি।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর জিহাদে অন্যতম সঙ্গী ছিলেন তাঁরই ফয়েজ ও তাওয়াজ্জুহর নূরে আলোকিত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.), ওয়ারিস আলী বাঙালি (র.), কারামত আলী জৌনপুরী (র.) প্রমুখ। শিখদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র) যখন শাহাদাত বরণ করলেন, তাঁর উপরোক্ত তিনটি কর্মধারা তাঁর খলীফাগণ বিশেষত সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) ও কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর হাত ধরে বিপুলভাবে বিস্তৃত হয়। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর সাথে সায়্যিদ ওয়ারিস আলী বাঙালি (র.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র সায়্যিদ সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী (র.) কে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সীর খলীফাদের মাধ্যমে পরবর্তীতে ফুরফুরাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলামের খিদমতকারী অনেক সিলসিলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দীকী (র.) এর মাধ্যমে ছারছীনার মুজাদ্দিদে যামান শাহ সূফী নিছারুদ্দীন আহমাদ (র.), মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অধ্যাপক আব্দুল খালেক ছতুরাভী (র.), মাওলানা আব্দুল হামিদ (র.) প্রমুখ এই উপমহাদেশে দ্বীনী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন। অন্যদিকে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর মাধ্যমে উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর সিলসিলায় মাওলানা ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এবং তাঁর

মাধ্যমে শামসুল উলামা মাওলানা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ফুলতলী (র.) প্রতিষ্ঠিত ফুলতলী সিলসিলা খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

ছারছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.), শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.), আমার ওয়ালিদ মরহুম হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ (র.)- প্রত্যেকেই সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর মাধ্যমে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা সবসময় তাঁর তাজদীদী চিন্তাধারা লালন করেছেন। আমি মনে করি, ছারছীনা দরবার শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ পর্যন্ত যত খিদমত করিয়েছেন, তার পেছনে বালাকোটের ময়দানে সায়্যিদ আহমদ শহীদের আত্মত্যাগ ও শাহাদাতের প্রেরণা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পুরো দেশজুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার আলিয়া ও দ্বীনীয়া মাদরাসা, অসংখ্য মসজিদ ও খানকা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা, শুক্রবার সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা, স্কুলে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মুসলমানদের নামের আগে শ্রী এর পরিবর্তে মুহাম্মদ লেখার প্রচলন, টিকির পরিবর্তে টুপি এবং ধুতির পরিবর্তে লুঙ্গি-পাজামার প্রচলন ঘটানো ইত্যাদি সবই সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর সেই মিশনের ধারাবাহিকতা।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) কে অনেকে ওয়াহাবী বলে অপবাদ দিয়েছে। বিশেষত উইলিয়াম হান্টারসহ ইংরেজ মদদপুষ্ট লেখকরা এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। এ বিষয়ে জাতিকে সঠিক বিষয়টি জানাতে আমার ওয়ালিদ মরহুম অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি একবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর উপর অত্যন্ত দুর্লভ একটি বই দেখতে পান। বইটিতে তাঁর প্রতি এই অপবাদের জবাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বইটি বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) আমাদের সালফে সালিহীনের স্বার্থক উত্তরসুরী। তাঁর আদর্শের জন্য স্বপ্ন দেখি- একদিন এই পৃথিবী থেকে যাবতীয় শিরক-বিদআত ও অপসংস্কৃতি দূর হবে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, সর্বত্র ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ।

[লেখক: পীর ছাহেব, ছারছীনা দরবার শরীফ; আমীর, বাংলাদেশ জমিয়াতে হিযবুল্লাহ]

সমকালীন ও দেশীয় পরিস্থিতিতে
সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর আদর্শ

প্রসেফর ড. আনিসুজ্জামান

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) উত্তর ভারতের রায়বেরেলীর একটি বিখ্যাত হাসানী সায়্যিদ পরিবারে ১৭৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালের ৬ই মে পাঞ্জাবের হাযারা জেলার বালাকোট প্রান্তরে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের পর প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর জীবন ও আদর্শের উপর ইংরেজিসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। প্রধানত: রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এসব রচনায় একদিকে যেমন তাঁকে স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার এবং সত্যিকার ইসলামের একজন প্রকৃত ধারক ও বাহকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তেমনি আবার তাঁকে সাম্প্রদায়িক ও ওয়াহাবী বলে চিত্রিত করার অপচেষ্টাও করা হয়েছে। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমরা তাঁর সঠিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো এবং সে সাথে সমকালে তাঁর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করবো। প্রথম কথা হলো, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) ওয়াহাবী ছিলেন না। এর অনেক কারণের একটি হলো- ওয়াহাবীরা যেখানে তাসাওউফ অস্বীকার করে, সেখানে তিনি হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য সন্তান ও খলীফা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র.)-এর বিখ্যাত খলীফা ছিলেন। তিনি আমাদের ভারতবর্ষের সুপরিচিত চার তরীকা- চিশ্‌তিয়া, কাদিরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকায় খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাসাওউফে এমন উন্নতি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন যে তিনি পরবর্তীতে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া নামে একটি শিরক ও বিদআতমুক্ত সমন্বিত সূফী তরীকা প্রবর্তন করেন।

দ্বিতীয়ত ওয়াহাবীরা যেখানে ওলী-আউলিয়া, নবী-রাসূল এমন কি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-কেও মৃত মনে করে, সেখানে তিনি অসংখ্যবার প্রিয়তম রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে যিয়ারত করেন ও তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ ও হিদায়াত লাভ করেন।

তৃতীয়ত অবিভক্ত বাংলা ও আসামে যে সব সূফী তরীকা তথা দরবার প্রধান যথা– ফুরফুরা, জৌনপুর, শর্ষিনা, সুরেশ্বর, আটরশি, চন্দ্রপাড়া, এনায়েতপুর ইত্যাদি, এগুলোর সিলসিলা এক পর্যায়ে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীতে যেয়ে

মিলিত হয়েছে (যদিও এসবের কোনো কোনো ধারা বর্তমানে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে)। সুতরাং তাকে ওয়াহাবী বলা মানে এমন সকল সূফী তরীকাকেও ওয়াহাবী বলে সাব্যস্ত করার শামিল। বাংলা ও আসামের প্রভাবশালী সূফী আলিম বর্তমান আসামের করিমগঞ্জের বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) তাঁরই সূফী তরীকার একজন পরবর্তীকালীন শায়খ। আর হযরত বদরপুরীর বিখ্যাত খলীফা সিলেটের ফুলতলী দরবার শরীফের পীর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল লতীফ চৌধুরী (র.)। সুতরাং যেসব বক্তা ও লেখক সায়্যিদ আহমদ বেরলভীকে ওয়াহাবী বলে চিহ্নিত করেন তাঁরা তথ্য সংকটের শিকার। তবে তাঁকে যে ওয়াহাবী বলা হয় তার কি কোনোই কারণ নেই? হ্যাঁ আছে। আমরা জানি, ইংরেজরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী আলিমদের আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী বলে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করেছিল। উইলিয়াম হান্টারসহ অনেক লেখকই এ ধারার অপতৎপরতার সাথে যুক্ত ছিল। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, ভারতে বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল সূফীগণের মাধ্যমে। তাই এখানে যে ইসলাম জনগণের হৃদয়ের গভীরে শেকড় গেড়েছে সেটি সূফী আদলের ইসলাম। তাই যদি কোনোভাবে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী আলিমদের সূফীবিরোধী তথা ওয়াহাবী বলে চিত্রিত করা সম্ভব হয় তাহলে জনমনে তাঁদের যে উচ্চ স্থান আছে সেটা চলে যাবে এবং জনসাধারণ তাঁদের অনুবর্তী হবে না। এই গভীর মনো-সামাজিক ধর্মীয় কারণে সায়্যিদ আহমদসহ সেই সব সর্বত্যাগী সাহসী আলেমদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিয়াতের অভিযান উত্থাপন করার অপচেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ–সায়্যিদ আহমদ বেরলভী পরিচালিত সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক ছিলো, কথাটিও কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াও সাধারণ নৈতিকতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এ অভিযোগ সমর্থন করে না। প্রথমে আমরা এ অভিযোগটি সাধারণ নৈতিক যুক্তির আলোকে বিচার করবো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। এটি সাধারণ্যে গৃহীত একটি কর্মনীতি। জাতিসংঘ স্বীকৃত মানবাধিকারের প্রথম প্রস্তাবটিই হলো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। প্রতিটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। জাতিসংঘ স্বীকৃত সার্বজনীন মানবাধিকারের অপর একটি অনুচ্ছেদের মর্মকথা হলো- মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও প্রচার করার অধিকার আছে। তাছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত নৈতিকতায় বলা হয়েছে যে, সব যুদ্ধ এক পর্যায়ের নয়। কিছু যুদ্ধ আছে অন্যায় যুদ্ধ, কিছু যুদ্ধ আছে ন্যায় যুদ্ধ, অন্য কথায় সব যুদ্ধই অন্যায় নয়। তা যদি হতো তাহলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনৈতিক হতো। তা তো নয়ই বরং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি ন্যায় যুদ্ধ, বাঙ্গালী জাতির

অস্তিত্বের লড়াই। আমরা তখন ছিলাম আক্রান্ত। তাই এর প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধ কেবল গ্রহণীয়ই ছিল না বরং আবশ্যকীয় ছিল। তা না হলে পশুশক্তির কাছে মানবতাকে আত্মসমর্পন করতে হত, যেটি কখনও নৈতিক হতে পারে না। বেরলভী (র.) কর্তৃক শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এরই ক্রমধারায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সব সংগ্রামই ন্যায়সঙ্গত। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত লড়াই তাই নৈতিক লড়াই। এই ন্যায় যুদ্ধের একজন নির্ভীক সেনাপতি ছিলেন হযরত বেরলভী (র.)। অবশ্য ন্যায়যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ এর প্রয়োজন থাকে এবং সে ক্ষেত্রেও কতগুলো নৈতিক সীমা ও শর্ত মেনে চলতে হয়। তা না হলে যুদ্ধ তো ন্যায় যুদ্ধ হবে কিন্তু সীমা অতিক্রমকারীর আচরণ নৈতিক হবে না। আমরা যদি সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সময়ের পশ্চিম ভারতের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, সত্যিই সেখানে মুসলমানগণ ছিল চরমভাবে নির্যাতিত। যুদ্ধাংদেহী শিখ নেতারা নির্বিচারে মুসলমানদের উপর সীমাহীন নির্যাতন করে যাচ্ছিল। এসব নির্যাতিত মুসলমানদের জান-মাল ও সম্মান রক্ষা করার সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হতে পারে না বরং এটি শক্তিমান সাহসী মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি মানবিক কর্ম এবং অবশ্যই নৈতিকও বটে। এবার আমরা দেখবো এ ব্যাপারে ইসলাম কী নির্দেশনা দেয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নিপীড়িত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ মুসলমান বলে তারা সাধারণ মানবসুলভ আচরণও পাবে না বলা তো চরম জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর নামান্তর। এখন আমরা পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াত ও রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস থেকে একটি প্রাসঙ্গিক হাদীস উদ্ধৃত করবো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে সে সব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করোনা যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক! যালিমদের এ জনপদ থেকে বের করে আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাও, তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করো এবং আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও" (৪:৭৫)। পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো নাজায়িয কাজ দেখে, ক্ষমতা থাকলে সে যেন তা হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগে বন্ধ করে দেয়। যদি তার ততটা ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে যেন যবান দ্বারা খারাপ কাজের প্রতিবাদ করে। যদি এতটা ক্ষমতাও তার না থাকে তাহলে যেন সে অন্তর দ্বারা এ ধরনের কাজকে ঘৃণা করে, আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" (মুসলিম)

সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি প্রথম জীবনে গতানুগতিক কিতাবী লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী ছিলেন না।

জন্মগতভাবে তিনি সুঠাম ও শক্ত গঠনের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের শরীর গঠনমূলক খেলাধুলা ও ব্যায়ামে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি পরোকারী ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যে তিনি ছুটে যেতেন। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি যৌবনে মধ্য ভারতের টোংক-এর নবাবের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং একজন দক্ষ সৈনিক ও পরবর্তী সময়ে কৌশলী সেনাপতি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। বলা বাহুল্য, এমন একজন মানুষের পক্ষে স্বজাতি ও স্বদেশের দুঃখের দিনে নীরব দর্শকের ভূমিকায় বা কেবল ওয়ায নসীহত করে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই কুদরতই অলক্ষ্যে তাঁকে গড়ে তুলছিল আগামী দিনে অধঃপতিত ও নির্যাতিত মুসলিম জাতি ও ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য স্বদেশীয় অত্যাচারী শিখ ও বিদেশী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা, এ সংগ্রামকে সংহত করা ও নেতৃত্ব দানের জন্য। একজন লেখক অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী পরিচালিত আন্দোলন নবুওয়াতের অনুসরণে পরিচালিত ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল এবং তা সফল হতো, যদি না তিনি সূফীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। তাঁর মতে সূফীবাদ থেকে সত্যিকার সফলতাকামী ইসলামী প্রচেষ্টাকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। উল্টোভাবে এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়, এক. তিনি ওয়াহাবী ছিলেন না; দুই. (লেখকের ভাষায়) সূফীবাদ অংশটুকু বাদ দিলে তার আন্দোলন সঠিক ইসলামী আন্দোলন ছিল। এবার আমরা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর একটি চিঠি থেকে কিছুটা উদ্বৃতি দেব, যে চিঠিতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, কোনো পার্থিব বা জাগতিক কারণে তিনি সংগ্রাম করছেন না। কোনোরূপ উচ্চাভিলাষ পূরণ বা সুনাম অর্জন করাও তাঁর লক্ষ্য নয় বরং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার রক্ষা করাই তাঁর সব কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

"... কেউ কেউ ধনৈশ্বর্য ও রাজ্য দখলের জন্য, আবার কেউ কেউ নিজের বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য, আবার কেউ কেউ শাহাদাতের গৌরব অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু এ যুদ্ধে আমার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান রবের নির্দেশ পালন করা, যিনি একমাত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। মহা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ এ কথার সাক্ষী যে, এ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা তাঁর হুকুম পালন করা ব্যতীত আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এতে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের কোন স্পৃহা না আমার মুখে কখনও উচ্চারিত হয়েছে, আর না কখনো অন্তরে উদিত হয়েছে। ... সারকথা, আমার না আছে বীরত্ব প্রদর্শনের কোনো হীন উদ্দেশ্য, আর না আছে রাজত্ব হাসিলের কোনো স্বার্থ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, যদি কোনো সম্মানিত শাসক ও শীর্ষ স্থানীয় সরদার ইসলাম কবূল করেন তাহলে আমি তাঁর বীরত্ব শতমুখে

অকপটে স্বীকার করে নেব, হাজার প্রাণের বিনিময়ে হলেও তার সাম্রাজ্যের উন্নতি কামনা করবো এবং তাঁর সরকারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাব।" [সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫]

কেবল আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তিনি সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। এটি মানুষের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সুদূর বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর সংগ্রামী কাফেলায় যোগদান করে। ভারতের সীমা অতিক্রম করে আফগানিস্তান থেকেও অনেক লোক তাঁর সাথে শরীক হয়। অনেক হিন্দু ও শিখ মুসলমান হয়ে তাঁর সাথী হয়। কিন্তু গোত্রবাদের সংকীর্ণতা, কিছু সীমান্ত সরদারদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ও কঠোর হৃদয়ের কিছু সংখ্যক শিখদের নিষ্ঠুরতা (নির্বিচারে নারী ও শিশুদের হত্যা, ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি) মুক্তিকামী মানুষের এ অগ্রযাত্রাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। এক অসম সম্মুখ সমরে সিংহপুরুষ এ মর্দে মুমিন ও সাচ্চা মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আর সে সাথে রসূলের আদর্শে একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ মানবিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

এখন আমরা অতি সংক্ষেপে বর্তমান সময়ে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মাত্র দু'টি কথা বলবো। প্রথম কথা হলো: তাঁর আদর্শ হলো সূফীবাদী ইসলাম, তবে তাঁর সূফীবাদ নিষ্ক্রিয়, বিদআত মিশ্রিত সূফীবাদ নয়। এটি জীবনমুখী, সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজী রাখা সূফীবাদ। সূফীবাদ হলো ইসলামের প্রাণ। প্রাণহীন দেহ দুর্গন্ধ ছড়ায়। মহান আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও তাঁর আদর্শের পূর্ণ অনুকরণ ব্যতীত সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত সূফী চেতনাহীন ইসলাম পরিশেষে জাগতিক সুবিধাবাদিতা ও ভোগবাদী রাজনৈতিক ফায়দা লুটার কৌশলে পরিণতি লাভ করে। মুসলমানদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস এ কথার সত্যতা বহন করে। বাস্তবতা হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়তের অনুসরণ ও অনুবর্তিতাহীন সূফী সাধনা নাফসানিয়াতের কানাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলে। স্বার্থবাদী নফসপূজারী ভন্ড সূফীদের জীবন ও কর্ম দেখলে যেকোনো চোখ-কান খোলা মানুষের কাছে এ ধারার সূফী পথের বিভ্রান্তি ধরা পড়বে। আজকের মুসলিম দুনিয়ার দিকে তাকালেও আমরা প্রকৃত সূফী চেতনাহীন ইসলামী প্রয়াস ও ভন্ড সূফী সাধকদের ধর্মের নামে ব্যবসায় পরিচালনা লক্ষ্য করলে জাগতিক প্রয়াসের মধ্যে প্রকৃত সূফী জীবনবোধ যুক্ত করার অপরিহার্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। সায়্যিদ আহমদ

বেরলভী (র.)-এর জীবনাদর্শ আমাদের পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এ সঠিক রাজপথের দিকে নিরন্তর আহ্বান জানায়।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর দ্বিতীয় আদর্শ হলো, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করে যাওয়া। ইসলাম সাম্প্রদায়িক অর্থে কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম হলো একটি সর্বমানবিক, সর্বকল্যাণসমৃদ্ধ জীবনমুখী আদর্শ। ইসলামে আল্লাহর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সমস্ত বিশ্বের কেবল স্রষ্টা নন, তিনি করুণাময় প্রতিপালক, পরম ন্যায় বিচারক ও সব শুভ ও কল্যাণের সংরক্ষক। ঠিক একইভাবে রাসূল (সা.) কেবল আরববাসী বা মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক নন। তিনি সব সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতীক। ইসলামী জীবন পদ্ধতি জন্মগত নয়, সত্য-উপলব্ধি-জাত। সেজন্য ইসলামে কেবল জন্মগত কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম নির্ভর। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকী'। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যার কর্ম তাকে পিছনে টানে, তার বংশ পরিচয় তাকে আগে বাড়াতে পারে না।

আমরা যদি এখন বিশ্বপরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে দেখবো, নয়া উপনিবেশবাদ বিশ্বায়নের নামে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিসত্তাকে গ্রাস করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে, শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তারা আংশিক তথ্য দিয়ে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করছে, একটা কৃত্রিম সংস্কৃতি নির্মাণ করতে প্রয়াসী হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র তৈরী করে সেগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অশুভ ব্যবহার করে যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে। অর্থ ও বিভিন্ন অনৈতিক পদ্ধতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে মেধাবীদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে অথবা নিষ্ক্রিয় করে রাখছে অথবা ভোগবাদী করে তুলছে। এসব কারণে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব আরও গরীব হচ্ছে এবং গরীবের সংখ্যা বাড়ছেই। এভাবে এক অশুভ কর্মতৎপরতায় অনেক মানুষের জীবন বাধা পড়ছে। এর বিরুদ্ধে কি শুভ বুদ্ধির অধিকারী বিবেকবান মানুষের কিছুই করণীয় নেই? সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর মহৎ ও সাহসী, ত্যাগী ও তৎপর জীবন এ দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আলোর দিশা হিসেবে কাজ করে। তাঁর আহ্বান মানবতার কল্যাণকামী সব মানুষের জন্য, এখানে কোনো ধর্ম ও জাতির প্রশ্ন নেই। তাঁর এ ডাক পরিবর্তনকামী তথা শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের সব কর্মীদের জন্য। সে কারণে তাঁর আদর্শ সমকালীন দেশীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে খবুই প্রাসঙ্গিক। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

[লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর প্রভাব ও উত্তরাধিকার

নোমান আহমদ

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না; এটি ছিল উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসানের শুরুও। এর মধ্য দিয়ে অগণিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের বীজ বপিত হয়। দিল্লি, লখনৌ, মুর্শিদাবাদ, হায়দরাবাদসহ মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, এবং এ অবস্থার ভেতর থেকেই জন্ম নেয় এক প্রতিরোধী ধর্মীয় চেতনা। এই চেতনাই রূপ পায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জাগরণ ও প্রতিরোধে- যার অগ্রদূত হন শহীদ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) (১৭৮৬-১৮৩১)। তিনি শুধু একজন ধর্মগুরুই ছিলেন না, ছিলেন একজন সংগঠক, সংস্কারক ও আত্মত্যাগী মুজাহিদ। তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি ছিল দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম ও শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : মুসলিম শক্তির পতন ও বিদেশি আধিপত্যের উত্থান
১৭০৭ সালে জিন্দাপীর সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের ইন্তিকালের পর মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করে। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ এবং ইউরোপীয় বণিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মিলে সাম্রাজ্যকে ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় উত্তর ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ আধিপত্যের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলে।

মুসলমানদের শাসন কাঠামো ভেঙে পড়লে মুসলিম সমাজে একটি গভীর অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়। শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিকভাবেও মুসলমানরা প্রান্তিক হয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হতে থাকে, ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং ইসলামী জীবনধারা রক্ষা

করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময়ে একটি বড় অংশ হতাশা ও নির্জনতাকে বেছে নেয়, কিন্তু উলামা ও মুজাহিদদের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী দল এই পতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেন।

এই ঘনঘোর সংকটকালে আশার আলো হয়ে আবির্ভূত হন ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (১৭০৩-১৭৬২), যিনি উপলব্ধি করেন যে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন এক গভীর আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আত্মশক্তি যদি ফিরিয়ে আনা যায়, তবে মুসলমানরা আবারও ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ স্থান ফিরে পেতে পারে। তাঁর এ বিপ্লবী চিন্তাধারাই ছিলো পরবর্তীতে জিহাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, যার বাস্তব রূপদাতা হলেন শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)।

ইসলামী প্রতিরোধের সূচনাঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তার উত্তরসূরি চিন্তাধারা

ঐতিহাসিকদের মতে, উপমহাদেশে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় আধ্যাত্মিক ও চিন্তাগত বিপ্লবের মাধ্যমে। এর মূল কারিগর ছিলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (১৭০৩-১৭৬২)। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমানদের দুর্দশা শুধুমাত্র বাহ্যিক রাজনৈতিক পতনের কারণে নয়, বরং আত্মিক দুর্বলতা, শরীআহ থেকে বিচ্যুতি, এবং সমাজে বিদআত ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাবই মুসলিম সমাজের মূল সংকট।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন। তিনি আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালিকে চিঠি লিখে ভারতে আগমনের আহ্বান জানান, যেন দিল্লির মুঘল রাজধানীকে মারাঠা ও শিখ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা যায়। এটি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংযোগকে বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা ছিল। তিনি "তাওহীদ" ও "ইখলাস"-এর ভিত্তিতে মুসলিম সমাজে ঐক্য, শুদ্ধতা ও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন শুরু করেন, যা পরবর্তীতে একটি সুসংগঠিত প্রতিরোধে রূপ নেয়।

তাঁর চিন্তাধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী উত্তরসূরি ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (১৭৪৬-১৮২৪)। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে দিল্লির মুসলমানদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন ও বাহ্যিক-আধ্যাত্মিক বিপর্যয় দেখে তিনি ১৮০৩ সালে একটি ঐতিহাসিক ফাতওয়া জারি করেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেন- ভারত "দারুল ইসলাম" নয়, বরং "দারুল হারব"। এর অর্থ, ভারত এমন একটি ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে যেখানে

ইসলামী শাসন নেই। মুসলমানদের সেখানে নিজেদের ধর্ম ও স্বত্বা রক্ষার জন্য জিহাদ করতে হবে।

এই ফাতওয়া নিছক একটি ধর্মীয় অভিমত ছিল না, এটি ছিল একটি জাগরণী আহ্বান, যা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও আত্মমর্যাদার আগুন জ্বেলে দেয়। এই ফতোয়াই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর জিহাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (র.) চিন্তাধারাকে তিনি মাঠে নামিয়ে আনেন বাস্তব সংগ্রামের মাধ্যমে।

সায়্যিদ আহমদের জিহাদ : উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কৌশল

হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) (১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন উপমহাদেশে প্রথম সংগঠিত জিহাদী আন্দোলনের পুরোধা। তাঁর জিহাদ ছিল কেবল সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রয়াস। তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধি, সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক মুক্তির ত্রিমাত্রিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসেন, যার ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ।

জিহাদের উদ্দেশ্য

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) মূলত উপমহাদেশে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' এ আর্দশের ভিত্তিতে ইসলামী হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের আযাদী ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জিহাদের আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানরা যদি প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে যায় এবং নিজেদের ঈমান, আমল ও নৈতিকতায় দৃঢ় হয়, তাহলে তারা সকল জুলুম, শিরক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল:

- শিরক ও বিদআতের মূলোচ্ছেদ
- ইসলামী শরিয়াহর প্রতিষ্ঠা
- মুসলমানদের আত্মিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণ
- জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ

নীতিমালা ও কৌশল

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর আন্দোলন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল না; এটি ছিল পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত। তিনি জিহাদের জন্য এমন কিছু বাস্তবতা ও শরঈ উপলক্ষ্য সামনে নিয়ে আসেন, যা তাঁর দাওয়াতকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. অত্যাচারিত মুসলিম জনগোষ্ঠী: গোটা ভারতবর্ষে মুসলমানরা পরাধীন থাকলেও বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের অবস্থা ছিল বিশেষ সঙ্গীন; তারা শিখ রাজা রণজিত সিং এর শাসনে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছিলেন।

২. ধর্মীয় স্বাধীনতার অনুপস্থিতি: মুসলিমরা আযান দিতে পারত না, মসজিদ নির্মাণে বাধা ছিল, কুরবানীর অনুমতি ছিল না।

৩. ইসলামী নেতৃত্ব ও খিলাফতের অভাব: ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন ও খিলাফত অনুপস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় তিনি "আমীরুল মুমিনীন" হিসাবে খিলাফত কায়িমের লক্ষ্যে দ্বীনী ও রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৪. আত্মশুদ্ধির উপর জোর: জিহাদ শুরু হওয়ার আগে আকীদা ও আমলের পরিশুদ্ধির জন্য ইলমে তরীকতের চর্চা তথা তাযকিয়ায়ে নাফসের চর্চা ও প্রক্রিয়ার সাথে অনুসারীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে যুক্ত করেন।

৫. সংগঠিত কাঠামো ও বায়আত প্রথা: তিনি "তরীকত" ও "ইমারত"-এই দুই ভিত্তির উপর তাঁর আন্দোলন সাজান, যেখানে বায়আতের মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা হয়।

সায়্যিদ আহমদ (র.) তাঁর দাওয়াত কার্যক্রম ছড়িয়ে দেন গোটা উত্তর ভারতে-লখনৌ, কানপুর, দিল্লি, পাটনা, ও সিলেট পর্যন্ত। তিনি সাধারণ মুসলমানদের পাশাপাশি বিশিষ্ট উলামা, সুফী ও তরুণদের একত্রিত করেন। তিনি স্বীয় মুরশিদের কাছ থেকে 'বিলায়েতে আম্বিয়া' অর্জনের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর রূহানিয়্যতের প্রভাব এত বেশি ছিল যে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাঁর মুরীদানের সংখ্যা "ত্রিশ লাখে" পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষে প্রচলিত চারটি মকবুল ও মশহুর সিলসিলা, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়ার সমন্বয়ে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

বালাকোট যুদ্ধ ও শাহাদাত : ইতিহাসের মোড় ঘোরানো ঘটনা

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর জিহাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত ও স্মরণীয় অধ্যায় হলো ১৮৩১ সালের বালাকোট যুদ্ধ। দীর্ঘদিন প্রস্তুতির পর তিনি তাঁর সংগঠিত বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের শিখ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে তিনি বেছে নেন খাইবার পাখতুনওয়া রাজ্য, বিশেষ করে বালাকোট, যেটি তখন শিখদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং কৌশলগত দিক থেকে উপযুক্ত ছিল।

বালাকোট যুদ্ধের পটভূমি

১৮২৬ সালে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে অত্যাচারী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হন। ১৮২৭ খ্রি. ১১ ই জানুয়ারি "তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' নির্বাচিত হন। পরদিন থেকে জুমুআর খুতবায় তাঁর নাম সংযোজন করা হয়। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) ও তাঁর সঙ্গীরা ১৮৩০

সালের শেষে বালাকোটে পৌঁছান এবং মুসলিম জনসাধারণের মাঝে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের আগমন শিখ প্রশাসনের নজরে পড়ে যায়। শিখ বাহিনীর প্রধান শের সিং বিশাল বাহিনী নিয়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর অবস্থানে আক্রমণ চালায়।

ঐতিহাসিক সংঘর্ষ

১৮৩১ সালের ৬ মে, শুক্রবার, ফজরের নামাযের পর বালাকোটের পাহাড়ি উপত্যকায় সংঘটিত হয় এক অসম যুদ্ধ। শিখ রাজা রনজিত সিংয়ের পুত্র শের সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর নেতৃত্বাধীন ৬০০/৭০০ জনের মুজাহিদ দল। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) ও তাঁর মুজাহিদগণ সংখ্যায় কম, অস্ত্রে দুর্বল, কিন্তু ঈমান ও আদর্শে দৃঢ় ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়চিত্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে শিখদের সুসংগঠিত বাহিনীর প্রবল আক্রমণে এক পর্যায়ে মুজাহিদদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই লড়াইয়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) ও তাঁর সঙ্গীয় প্রায় তিনশত জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদীর তাৎপর্য

এই শাহাদাত শুধু এক মহানায়ক ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর মৃত্যু ছিল না; বরং এটি ছিল এক যুগান্তকারী চেতনার উত্থান। ইতিহাসের এক মোড় ঘুরে যায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে।

- এর মাধ্যমে একটি সংগঠিত ইসলামী প্রতিরোধের চেতনা রচিত হয়, যা পরবর্তীতে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস ও দাওয়াতি জোশ জাগিয়ে তোলে।
- জিহাদের ধারণা ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
- বালাকোট ময়দান শহীদদের রক্তে পবিত্র হয়ে ওঠে, যেটি মুসলিম জনগণের কাছে এক আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

চেতনার উত্তরাধিকার : ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত

বালাকোটের যুদ্ধ এবং সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর শাহাদাতের পর, তাঁর জিহাদী আন্দোলন শুধু একটি স্থানীয় সংগ্রাম বা অস্থায়ী বিদ্রোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। এই চেতনাই ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ-এর পটভূমি প্রস্তুত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারণাকে শক্তিশালী করে।

১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আঘাত আসে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল সামরিক অস্থিরতা এবং ব্রিটিশ শাসনের বর্ণবাদী আচরণ, তবে এটি অল্প সময়ের মধ্যে একটি বৃহত্তর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। বিশেষভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ঐতিহাসিক চেতনা, যা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-এর নেতৃত্বে উদ্ভূত হয়েছিল, এই বিদ্রোহের পেছনে যে চেতনা ও উদ্দেশ্য প্রভাবক হিসাবে ছিল। তাঁর আত্মত্যাগ, শুদ্ধতা এবং ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার আহ্বান সিপাহীদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

এটি ছিল একটি জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে সায়্যিদ আহমদ (র.)-এর আন্দোলনের অন্তর্নিহিত চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়, কিন্তু এই বিদ্রোহই পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চেতনা শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়ে ওঠে। সায়্যিদ আহমদের আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের বিজয় এবং মুসলিম জনগণের মুক্তি, ১৮৫৭-এ সেই একই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল-একটি ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সত্যেন সেন তার "ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা" গ্রন্থে বলেন, "বস্তুতপক্ষে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আগে থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী। সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে জিহাদ চালিয়ে আসছিল তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলতে হবে। বিদেশি ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর হৃত-গৌরব অর্জনে মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব খুবই প্রবল ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর এই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সেই ব্রিটিশ বিরোধিতা আরো বেশি প্রখর হয়ে উঠেছিল। এই অনুকূল পরিপক্ব পরিবেশেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয়েছিল।"

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বালাকোটের প্রভাব

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর দাওয়াতী কাজ এবং তাঁর আত্মত্যাগ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সাথে এক অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক তৈরি করেছিল, যা পরবর্তীতে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংগ্রামের প্রথম সূচনা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, তবে পরবর্তী

সময়ে মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা এবং সমাজ সংস্কারকরা তাঁর আন্দোলনের আত্মিক ও ধর্মীয় দিকগুলোকে মেনে নিয়ে, বেসরকারিভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে শুরু করেন।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) ও তাঁর মুজাহিদদের আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামিক চেতনা, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলন, এবং পরবর্তী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিতে সায়্যিদ আহমদের চেতনাই এক শক্তিশালী প্রভাব তৈরি করেছিল। তাঁর জিহাদ ও ধর্মীয় উত্থান বারবার মুক্তির সংগ্রামে দীপ্তিময় আলো হিসেবে উপস্থিত হয়।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর জিন্দেগীর ব্যপ্তিকাল যদিও মাত্র ৪৫ বছর ছিল, কিন্তু তাঁর তাজদীদ, জিহাদ ও তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর কল্পনার চেয়েও সূদুর প্রসারী। তাঁর অন্যতম খলীফা হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত শাহ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ও গাযীয়ে বালাকোট হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর সিলসিলা যুগ যুগ ধরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। গত দুই শতাব্দী ধরে এমনকি অদ্যবধি এ অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাঠন, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধ, কোটি মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়দান, লক্ষ কোটি পথহারা বনী আদমকে সঠিক পথের দিশা দান, লক্ষাধিক মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব, খানকাহ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান-লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, ইসলামী শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষা মুসলমানদের তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযত করা, সর্বোপরি দীন ইসলামের যে পরিমাণ খেদমত তাঁর অনুসারীরা আনজাম দিয়েছেন তার কাছাকাছি তো দূরের কথা সিকিভাগও অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি।

এইভাবে, সায়্যিদ আহমদ (র.) এর আন্দোলন শুধুমাত্র একটি ইতিহাস নয়, এটি ছিল এক নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, এক সশস্ত্র সংগ্রাম, এবং এক অনুপ্রেরণাদায়ী চেতনার উত্থান, যা স্বাধীনতার সংগ্রামে এক অমর অধ্যায় রচনা করেছিল।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর জিহাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে এবং গণমানুষের হৃদয়ে এ আন্দোলনের প্রতি তৈরি হওয়া

ভালোবাসার রুখে দিতে ব্রিটিশরা নানা ধরনের কূটবুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। এর অন্যতম ছিল কোম্পানির বেতনভুক্ত কলমসৈনিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থটি। এতে তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর জিহাদী আন্দোলনকে তীব্র নিন্দা জানান এবং একে ওয়াহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেন। এটি যে একটি দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা রটনা তা বুদ্ধিমান মাত্রই সহজে অনুধাবন করতে পারার কথা। তার এ মিথ্যা দাবির অপনোদনে অনেক তথ্য ও ব্যাখ্যা হাজির করার অবকাশ রয়েছে। লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সত্যেন সেনের "ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা" গ্রন্থের একটি প্যারা কেবল উদ্ধৃত করছি।

"দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই ব্রিটিশবিরোধী জেহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনইবা জানে। অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবি আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পরিনি। আবদুল ওয়াহাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কোনো সংযোগ ছিল না। তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবি আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।"

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর চেতনার অমরতা

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) ছিলেন একজন মহান ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগঠক এবং আত্মত্যাগী নেতা, যিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে যে জিহাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তা কেবল একটি শারীরিক সংগ্রাম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল। তিনি মুসলিম সমাজের ধর্মীয় চেতনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

বালাকোটে শাহাদাত বরণ করার পর, তাঁর চেতনা কেবল উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে নয়, বরং পুরো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক অনুপ্রেরণা হিসেবে রয়ে গেছে। সায়্যিদ আহমদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি শুদ্ধ ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে শিরক, বিদআত এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধের জিহাদ পরিচালনা করা হবে। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী শতাব্দীজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অমর স্মৃতি হিসেবে স্থান পেয়েছে।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তির মাধ্যম নয়, বরং তা একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির শক্তিও। তাঁর জীবন, সংগ্রাম এবং শাহাদাত ভারতীয় মুসলিমদের জন্য এক মহান শিক্ষা হিসেবে চিরকাল অমর থাকবে। এছাড়া, সায়্যিদ আহমদ (র.) এর অনুসৃত পথ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। তাঁর জিহাদ ও কুরবানী কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাজুড়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস, ঐক্য এবং সংস্কৃতির অটুট ভিত্তি হিসেবে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর জিহাদ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের আযাদি আন্দোলনের এক অবিনশ্বর চেতনা, 'খিলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়াত' এর আদর্শে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এক দেদীপ্যমান প্রেরণা। তাঁর জিহাদ, কুরবানি, বীরত্ব আর পৌরুষগাঁথা শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে আলো ছড়াচ্ছে লাখো কোটি অন্তরে। যখনই দ্বীন ইসলামের অনুসারীরা মুখোমুখি হন অত্যাচারী রণজিত সিং এর প্রেতাত্মার, যখনই বেনিয়া বেশে হাজির হওয়া ব্রিটিশ কিংবা তাঁর এদেশীয় দোসররা কেড়ে নিতে চায় মুসলমানদের আযাদী তখনই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে একখণ্ড 'বালাকোট' হয়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর 'জিহাদী আন্দোলনের' আবরণে।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)
উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার বাতিঘর
মারজান আহমদ চৌধুরী

উপমহাদেশে ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটেছিল ৮ম শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে। উমাইয়া শাসনামলে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের হাত ধরে ইসলামের বিজয় মশাল সাগরপাড়ের সিন্ধু ভূমিতে এক ঝলক আলো ফেলেছিল। কিন্তু প্রথম আগমনটি স্থায়ী হতে পারেনি। পাহাড়ি জলধারার মতো দ্রুতবেগে এসে, সেটি আবার মিলিয়ে গিয়েছিল সময়ের প্রতিকূল স্রোতে। তবে ক্ষণিকের এ আলোড়ন পরবর্তীদের স্থায়ী আগমনের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। ইরান আফগানিস্তানের পাহাড় মাড়িয়ে, কখনো আবার ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপমহাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন বহু সূফী শায়খ ও মুসলিম ব্যবসায়ীগণ। তাদের দ্বীনদারী, একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও উত্তম চরিত্র হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক-গৌড়ে কালিমা তায়্যিবার ধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করেছিল। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মুসলিম সত্তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে প্রখ্যাত সব ওলী-আউলিয়ার নাম। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেন, "ভারতবর্ষে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে ও ইসলামের ওপর চলবে, তার একটি সাওয়াব খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর আমলনামায় যাবে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর হাত ধরে উপমহাদেশের বুকে দ্বিতীয়বার ইসলামী শক্তির আগমন ঘটেছিল। সেবার আর পাহাড়ি জলধারা নয়; বহমান নদীর মতো স্থায়ীভাবে হিন্দুস্তানের মাটিতে পদচিহ্ন ফেলেছিল মুসলমানরা। তবে শক্তিশালী মামলুক, খিলজি, সায়্যিদ, মোঘল প্রমুখ মুসলিম রাজবংশ এ মাটিতে শাসন করলেও ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা খুব একটা নেই। সে কাজটি তখনও সূফিয়ায়ে কিরাম করে গেছেন।

তাজদীদের পথ পরিক্রমা

প্রথমদিকের মুত্তাকী সূফী শায়খরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ধীরে ধীরে তাসাওউফের নামে অনেক কুসংস্কার উপমহাদেশের মুসলমানদের

ভেতর প্রবেশ করেছিল। একইসাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল দ্বীনকে ধ্বংস করার এক অভিনব ষড়যন্ত্র। 'দ্বীনে ইলাহি' নামক এক কুফরি আকীদা প্রচার করা হচ্ছিল খোদ মোঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজদরবার থেকে। আল্লাহ তখন তাঁর প্রিয় বান্দা ইমাম আহমদ সিরহিন্দী (র.) (১৫৬৪-১৬২৪) এর মাধ্যমে উভয় দিক থেকে সমাগত ষড়যন্ত্র থেকে তার দ্বীনের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম সিরহিন্দী একদিকে তাসাওউফের নামে প্রবিষ্ট বাতিল আকীদাকে দফারফা করে তাসাওউফকে সুন্নাতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে এনেছিলেন। অপরদিকে তার ইলমী ও তাজদীদী কর্মসূচি 'দ্বীনে ইলাহী' নামক কুফরী মতবাদকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছিল। আজ অবধি তিনি মুসলমানদের কাছে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

ইমাম সিরহিন্দীর সমসাময়িক ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলভী (র.)। ইমাম সিরহিন্দী যখন কুফরের মোকাবিলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং বিদআত সরিয়ে সুন্নাত পুনর্জীবনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, শায়খ আবদুল হক তখন উপমহাদেশের উর্বর মাটিতে হাদীসে নববী ﷺ এর বীজ বপন করছিলেন। ইমাম সিরহিন্দীর তাজদীদ (সংস্কার) ও শায়খ আবদুল হকের ইলমী খিদমাত পরবর্তী শতাব্দীতে এসে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। সিন্ধুসদৃশ সেই বিন্দুর নাম ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) (১৭০৩-১৭৬২)।

উপমহাদেশ তো বটেই, সেই যুগে পুরো মুসলিম দুনিয়ায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র তুলনার বহুবিদ্যাজ্ঞ (Polymath) দ্বিতীয়জন ছিলেন না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের ফার্সি অনুবাদ করে কালামে ইলাহীকে জনসাধারণের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্রদের দ্বারা কৃত উর্দু অনুবাদ উপমহাদেশের কোণায় কোণায় কুরআনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছিল। একইসাথে তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলভী (র.) এর হাতে প্রোথিত ইলমে হাদীসের বীজকে সযত্নে লালন করে সুবিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন। মুওয়াত্তা ও মিশকাতের মতো বিশ্বখ্যাত হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যা রচনা করার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইলমুল হাদীস অধ্যয়নকে তিনি স্থায়িত্ব এনে দিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তুলনামূলক ফিকহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি হানাফি ও শাফিঈ মাযহাবের মধ্যকার দূরত্বকে সুশৃঙ্খলভাবে নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং মুজতাহিদ ইমামদের মতপার্থক্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। যুগের প্রয়োজনে ইমামদের

উসূলের ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের তথা গবেষণার রুদ্ধ দরজাকে তিনি পুনরায় উন্মুক্ত করেছেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুকাবিলা করার জন্য জ্ঞানভিত্তিক প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈমানের বিকল্প নেই। এজন্য তিনি তার লেখনিতে ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং ইসলামী শরীআতের হিকমত (Purpose And Objectives) খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এমন এক অদ্বিতীয় রচনা, যার উদাহরণ পুরো ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাসাওউফের জগতেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ এক বিস্ময়কর নাম। পিতার কাছেই তিনি তাসাউফের দীক্ষা পেয়েছিলেন। তাসাউফের তাত্ত্বিক জটিলতাকে তিনি সহজবোধ্য করেছেন, মুসলিম মননে আল্লাহর মারিফাতের নীর সিঞ্চন করেছেন, আত্মিক পরিশুদ্ধতাকে মুসলিম পরিচয় গঠনের পাথেয় বানিয়ে নতুন আঙ্গিকে হাজির করেছেন। সর্বোপরি ইমাম গাযালী ও ইমাম আহমদ সিরহিন্দীর পথ ধরে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে তাসাওউফকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করার সমুদয় কৃতিত্ব শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর, অন্তত তৎকালীন উপমহাদেশের বুকে। এছাড়াও তিনি একটি তথা 'সমন্বিত মুসলিম মানস' (Comprehensive Muslim Mindset) গঠন করার লক্ষ্যে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকসমূহ সূচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী খিলাফতের স্বপ্নকে যুগের উপযোগী সংস্করণে পুনরায় হাজির করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) পরবর্তীদের জন্য দ্বীনী খিদমতের পথকে সুগম করে গেছেন।

বালাকোট যুদ্ধের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর কৃতিত্ব

বালাকোট থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যত খিদমাত হয়েছে, সবই শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সাদাকাহ জারিয়াহ। বালাকোটের মহাবীর, ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার, আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সরাসরি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর রূহানী সন্তান। সায়্যিদ আহমদ (র.) 'আমীরুল মুমিনীন' হিসাবে যে অভিষিক্ত হয়েছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার খিদমাত দৃঢ় সাহসিকতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন এর পেছনে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ইলমী ও তাজদীদী খিদমাতের প্রভাব অনস্বীকার্য।

নব উদ্যমের সূচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সন্তানরা একনিষ্ঠভাবে পিতার খিদমাত সামনে এগিয়ে নিয়ে চলছিলেন। একই সময় ভারতের বিভিন্ন কোণায় মাথা তুলে

দাঁড়াচ্ছিল ইসলাম-বিধ্বংসী সর্পকুল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে বহু আগে থেকে উপমহাদেশের সমুদ্রতটে ব্যবসা করছিল ইংরেজ বেনিয়ারা। কিন্তু কেবল ব্যবসার নিয়ত কখনও তাদের ছিল না। তাদের চোখ ছিল ভারতের সিংহাসনে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ক্ষয়িষ্ণু মোঘল রাজদরবার চলছিল এক প্রকার দান-দক্ষিণা নিয়ে। ইংরেজদের বাড়ন্ত শক্তিকে মুকাবিলা করার সামর্থ মোঘলদের ছিল না। ওদিকে মহারাষ্ট্রের কট্টরপন্থী হিন্দু রাজা ছত্রপতি শিবাজী মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের ক্ষমতা দখল করার চেষ্টায় বহুবার ব্যর্থ হয়েছিল। তার বংশধররাও মোঘলদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিবলয়ে বারবার আঘাত হানছিল। এমনকি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও-এর বিশাল বাহিনী ক্ষণিকের জন্য দিল্লী দখল করে ফেলেছিল। ভারতের কোনো মুসলিম রাজা বা নবাবের শক্তি ছিল না মারাঠাদেরকে আটকানোর। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ পত্র লিখে আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালিকে ভারত আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৭৬১ সালে পানিপথের ৩য় যুদ্ধে আবদালির মুসলিম বাহিনীর হাতে মারাঠা বাহিনী পরাজিত না হলে তখনই ভারতের বুকে মুসলমানদের গণকবর রচিত হয়ে যেত। এছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব ছিল শিখদের হাতে, যারা ছিল কট্টর মুসলিম-বিদ্বেষী এবং মারাঠাদের সহায়ক। ত্রিমুখী শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাতো দুরের কথা; ভারতের মাটিতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করাও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এরকম একটি টালমাটাল সময়ে, ১৮০৬ সালে উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলি থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লীতে পা রাখেন এক সাহসী তরুণ। ২০ বছর বয়সী সে তরুণের নাম ছিল সায়্যিদ আহমদ। পিতার নাম সায়্যিদ ইরফান। রায় বেরেলিতে প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার পর ইলমে মারিফাত অর্জনের তৃষ্ণা মেটাতে সায়্যিদ আহমদ (র.) বেছে নিয়েছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর আঙ্গিনা। দিল্লীতে এসে তিনি বায়আত করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর বড় পুত্র ও খলীফা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র.) এর হাতে। পাঁচ বছর দিল্লীতে অবস্থানকালে ইমামুল হিন্দ ও তার সন্তানদের বিপ্লবী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা সায়্যিদ আহমদ (র.)-কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এক দিকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা, আরেকদিকে সমাজে ছড়িয়ে থাকা শিরক-বিদআতকে অপনোদন করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার তীব্র স্পৃহা জেগেছিল ২৫ বছর বয়সী এ মুজাদ্দিদে যামানের মনে।

প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি

সায়্যিদ আহমদ (র.) কিছুদিন আমির খানের সেনাবাহিনীতে একজন যোদ্ধা হিসাবে বিভিন্ন অভিযানে যোগদান করেন। একপর্যায়ে আমির খানের সাথে

সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি মনোনিবেশ করেন ভারতের মুসলিম সমাজের দিকে। কারণ মারাঠাদেরকে ঘায়েল করে ইংরেজরা তখন ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। হাতে যেটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। প্রস্তুতি ও লোকবল বৃদ্ধির আশায় মুসলিম সমাজে হাত দিয়ে সায়্যিদ আহমদ (র.) প্রচণ্ড হতাশ হন। তিনি উপলব্ধি করেন, বেশিরভাগ মুসলমান কেবল নামেই মুসলমান। ইসলামের মূল শিক্ষা ভুলে এরা ডুবে আছে নিজেদের বানানো রসম-রেওয়াজের মধ্যে। বারবারা যেটক্যাল্ফ তার Islamic revival in British India গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময়টি ছিল সায়্যিদ আহমদের জন্য পরিপক্কতা অর্জনের সময়। অর্থাৎ তিনি অমুসলিমদের সাথে জিহাদের পণ করে মাঠে নামলেও এটি খেয়াল করেননি যে, তার ঘরেই হাজার সমস্যা।

ইতিহাসবিদ অলিভিয়ার রয় লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তখন মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআতের অপনোদনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এ আন্দোলনের নাম দেন 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া'। দুনিয়ালোভী মৌলভীদের কাছে না গিয়ে সাধারণ জনগণের দ্বারে দ্বারে তিনি ইসলামের মূল শিক্ষা পৌঁছে দিতে শুরু করেন। এর ফল আসে আশার চেয়েও বেশি। সাধারণ মুসলমানরা দলে দলে তার দিকে হাত বাড়ায়। সায়্যিদ আহমদ (র.) উপমহাদেশের মুসলমানদের অঘোষিত আমীর হয়ে দাঁড়ান।

তার এ আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ইংরেজদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। ফলাফলস্বরূপ তারা তাকে 'ওয়াহাবী' বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। সুচতুর ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, এই খেতাব সায়্যিদ আহমদের উত্তাল ঢেউকে থামিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের সে কূটকৌশল সফল হয়নি। বারবারা যেটক্যাল্ফ লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তিনটি জিনিসকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করতেন। একটি হচ্ছে সূফীবাদের নামে ভ্রান্ত মতবাদ, আরেকটি শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা, আরেকটি হিন্দুদের রসম-রেওয়াজ। শিয়া ও ভ্রান্ত সূফীদের বিরুদ্ধে লাগাতার তিন বছর তিনি হাজার হাজার মুরিদীনসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমদ (র.) হজ্জ করতে যান। দুই বছর পর ফিরে এসে তিনি আবার দ্বীন কায়িমের স্বপ্নে মাঠে নেমে পড়েন। মারাঠা শক্তি তখন হিসাবের ভেতরেই ছিল না। অপরদিকে ইংরেজরা ছিল ধারণার চেয়েও বড় শক্তি। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎকালীন ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করেননি। এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি তাঁর কৌশলকে খানিকটা পরিবর্তন করে পাঞ্জাবকে তার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেন।

কারণ ভৌগলিক দিক থেকে হিসাব করলে, পশ্চিমে মরক্কো থেকে শুরু হয়ে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র পূর্বদিকে একেবারে আফগানিস্তান পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ছেয়ে আছে। এরপর পূর্বদিকে এগুলে সামনে পড়ে এক বিশাল বাধা, বৃহত্তর পাঞ্জাব। কিছু সীমান্ত এলাকা ব্যতীত পুরো পাঞ্জাবে তখন শিখদের আধিপত্য ছিল। এরপর আবার শুরু হয় মুসলমানদের আবাসভূমি (বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক)। এ দিক থেকে চিন্তা করে সায়্যিদ আহমদ (র.) পাঞ্জাব বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, পাঞ্জাব বিজয় করতে পারলে একদিকে যেমন ভারতের মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে যাবে, অপরদিকে পাঞ্জাবকে দুর্গ বানিয়ে পূর্বদিক (বাঙাল এলাকা) থেকে ধেয়ে আসা ইংরেজ শক্তির মুকাবিলা করাও সম্ভব হবে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরিকল্পনাটি যুগোপযোগী ছিল।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আলতাফ কাদির লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) আট হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তবে তিনি সরাসরি পাঞ্জাব যাননি। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তান পুরোটা ঘুরে লোকবল সংগ্রহ এবং জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচার করে করে তিনি আফগানিস্তানে পৌঁছান। কান্দাহার, কাবুল অতিক্রম করে নওশহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সাহস, আগ্রহ-উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়। ১৮২৬ সালে তিনি পাখতুন জাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান পেশাওয়ারে পৌঁছান। পাখতুনদের নেতৃত্ব ছিল পাঠানদের হাতে। সায়্যিদ আহমদ (র.) সেখানে গিয়েই ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করেন। পাঠানদেরকে সরিয়ে তার সাথে আগত আলিমদের হাতে তিনি নেতৃত্ব তুলে দেন। এরপর পাঞ্জাবের রাজা রনজিত সিং-এর কাছে পত্র পাঠান। পত্রে লেখা ছিল- হয় ইসলাম কবূল করো, নয় জিযিয়া দাও, নয় তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ (র.) পুরো পেশাওয়ারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন মুসলমানরা তাকে 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাবে ভূষিত করে। তবে পাঠানদের বিরোধিতাকে তিনি কাবু করতে পারেননি। সেই বছর পাখতুনদের অতর্কিত হামলায় সায়্যিদ আহমদের বাহিনীতে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়ে বরফঢাকা শীতকালে তিনি পেশাওয়ার ত্যাগ করে কাশ্মীরের দিকে পা বাড়ান। কিন্তু কাশ্মীরে তিনি পৌঁছাতে পারেননি।

বালাকোট যুদ্ধ

১৮৩১ সালের ৬ই মে জুমুআর দিন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর

সৈন্যরা শিখ রাজা রনজিত সিং-এর পুত্র শের সিং-এর নেতৃত্বাধীন দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ততদিনে সায়্যিদ আহমদ (র.) এর হাতে বাকি ছিল মাত্র ছয় থেকে সাতশ সৈন্য। যৎসামান্য এ রসদ নিয়ে তিনি কাশ্মীরের মানসেহরা জেলার পাহাড়ঘেরা বালাকোট প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু করেন। স্থানীয় মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে শিখদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। যেসব সামন্ত ও পাঠানরা শিখদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সায়্যিদ আহমদ (র.)কে আহ্বান করেছিল, তারাই পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে সাহায্য না করে গোপনে শিখদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। দুই ঘণ্টা স্থায়ী বালাকোটের সে যুদ্ধ ছিল যেন কারবালা যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়। মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ছোট ছোট দল বানিয়ে শিখদের আক্রমণ করতে থাকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে শিখদের অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ (র.)। মেটিকোট ঝর্ণার পাশে পড়ে থাকা তাঁর দেহটি প্রথমে কারও নজরে আসেনি। সৈন্যরা তাঁর খুঁজে সবটুকু শক্তি নিয়ে তখনও লড়াই করে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে শিখদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছু স্থানীয় মুসলমান কৌশলে সায়্যিদ আহমদের সৈন্যদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসার আহ্বান জানায়। দিশেহারা সৈন্যরা সেনাপতির খুঁজে পাহাড়ের চূড়ায় উঠামাত্র আগে থেকে সেখানে লুকিয়া থাকা শিখ সৈন্যরা তাদের ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালায়। এতেই মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করতে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমের অন্ধ্র-প্রদেশ থেকে মর্দান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এক বীর মুজাহিদ যেন অভিমান নিয়েই চলে যান মালিক-মাওলার দরবারে।

মাত্র ৪৫ বছরের জীবনে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) যে তুলনাহীন কাজ সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন, তার প্রভাব কল্পনার চেয়েও সুদূরপ্রসারী। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর তাজদীদ, তাঁর জিহাদ, তাঁর তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া যুগ যুগ ধরে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসার, শিরক-বিদআতের অপসারণ ও আত্মশুদ্ধির মূল অনুপ্রেরণা হয়ে আসছে। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর প্রধান দুই খলীফা হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ও হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.) এর সিলসিলাহ বৃহত্তর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এলাকায় ইংরেজদের প্রতিরোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলাম প্রচার, হিন্দুয়ানি রসম-রেওয়াজ অপসারণ, মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, ইলমে দ্বীন চর্চা, বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ সর্বোপরি ইসলামের যে পরিমাণ খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছে, অন্যরা কেউ এর সিকিভাগও করতে পারেননি। এক্ষেত্রে মাওলানা কারামত আলী (র.) এর নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) শাহাদাতবরণ করলেও তাঁর আদর্শ মরেনি, তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়নি। বরং সেদিন থেকে আজ অবধি এ উপমহাদেশের বুকে যতগুলো ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে আর হবে, সবগুলোই মহান বালাকোট আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। সহস্রাব্দের ঘুনে ধরা মুসলিম সমাজে ইসলামী দাওয়াত, খিলাফত, জিহাদ ইত্যাদি শব্দগুলোকে নতুন করে চিনিয়েছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। ক্ষণিকের জন্য হলেও দ্বীন কায়িমের স্বপ্নকে সার্থক করেছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। আল্লাহর জন্য শাহাদাতের অর্থ কী- সেটি দেখিয়েছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামী চেতনার বাতিঘর হয়ে আছেন আমীরুল মুমিনীন, ইমাম হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)।

উলামা-মাশায়িখের ঘোষণা

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর উত্তরসূরী হিসেবে আমরা গর্বিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ দ্বীনের দাওয়াত সকল মানুষের প্রতি উপস্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এ দায়িত্ব তিনি যেমন পালন করেছেন তেমনি সমগ্র মানব জাতির নিকট তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর উম্মতদেরকেও আদেশ করে গেছেন। নবী করীম (সা.)-এর এ আদেশের বাস্তবায়ন যুগ পরম্পরায় তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে দুনিয়ার দিকে দিকে বিশেষত: এ উপমহাদেশে আউলিয়া কিরামের অবদান সবচেয়ে বেশি। যে সকল ওলীআল্লাহ এতদঞ্চলে দ্বীনের খিদমতে নিজেদের জীবন কুরবান করে গেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.), খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.) হযরত শাহজালাল ইয়ামানী (র.), হযরত শাহ পরান (র.), শাহ মাখদুম (র.), কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.), ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশক্কর (র.) মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.), শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), হচ্ছেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধারারই উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। তিনি ছিলেন উপরোল্লেখিত বুযুর্গানে কিরামের সার্থক উত্তরসূরী, মুরশিদে বরহক, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক, নির্ভীক সিপাহসালার ও যামানার মুজাদ্দিদ। তাঁর মহান আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল– ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা। শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন, সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী কায়িম, বিদেশী আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের করালগ্রাস থেকে দেশ ও দেশের মযলুম জনতার মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ (নববী আদর্শে খিলাফত) প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। এ

লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি পরিচালনা করেছিলেন যে আন্দোলন তারই নাম 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া'। এ মহান মুরশিদ, বীর মুজাহিদ সংগ্রামের এক পর্যায়ে ১৮৩১ ঈসায়ী সালের ৬ই মে শাহাদত বরণ করেন বালাকোটে, জিহাদের ময়দানে। তাঁর শাহাদতের পরও থেমে যায়নি এ মহান আন্দোলন। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর চিন্তাধারা থেকে তিনি যে মিশন শুরু করেছিলেন তা জারি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন অবসান না হওয়া পর্যন্ত এবং নানা আঙ্গিকে তা অব্যাহত আছে আজও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার দীপশিখা জ্বলজ্বল করে আলো ছড়াচ্ছে এখনও। পীর-মাশায়িখ ও আউলিয়ায়ে কিরামের হাত ধরে তাঁর তরীকার ঝাণ্ডা আজো সমুন্নত। আমাদের দেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় সকল হক্কানী পীর-মাশায়িখ তাঁরই তরীকা ও আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করছেন। হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ও গাযীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ওলীআল্লাহ এতদঞ্চলে শহীদে বালাকোটের তা'লীম-তরবিয়ত ও রূহানী ফায়য বিলিয়ে গেছেন। তাঁদের বদৌলতে লাখো মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। শিরক বিদআত-কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ইহ-পরকালীন সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁদের তাওয়াজ্জুহ-এর বরকতে আমাদেরকে আলোকিত করেছেন, সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী (র.), হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.), শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.)-এর মতো বিখ্যাত ওলীআল্লাহগণ। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর উত্তরসূরীগণই এ দেশে তরীকা-তাসাওউফের সহীহ খিদমত আনজাম দিয়ে আসছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মাদরাসা, মসজিদ, মকতব, খানকা ইত্যাদি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান শরীআত ও তরীকতের খিদমতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে আছে। মোট কথা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে, দ্বীনী জাগরণ সৃষ্টিতে, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের লালনে, তাসাওউফের সহীহ খিদমত আনজামে বালাকোটের অমর শহীদ হযরত সায়্যিদ আহমদ (র.) এবং তার উত্তরসূরীদের অবদান ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এক অমর মনীষা, অক্ষয় চেতনা, প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও প্রবাহমান প্রেরণা। তিনি আপন কর্মে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছেন, তেমনি বেঁচে থাকবেন তাঁর চেতনার ধারক-বাহক, আলিম-উলামা ও পীর মাশায়িখ-এর কর্মের মধ্য দিয়ে। দুনিয়াব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দিনে এই মর্দে মুজাহিদের আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে গর্বিত। আমরা বিশ্বাস করি আমীরুল মুমিনীন ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) ও তাঁর উত্তরসূরীগণের অনুসৃত পথের যথাযথ অনুসরণ রাসূল (সা.)'র

নৈকট্য হাসিল ও আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনের অনন্য মাধ্যম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ, আমাদেরকে ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)-এর সিলসিলা ও তরীকার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে দ্বীনের যথাযথ খিদমত আনজাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

স্বাক্ষরদাতা উলামা-মাশায়িখ :

* হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ছাহেব –পীর ছাহেব ফুলতলী * হযরত মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ ছাহেব -পীর ছাহেব ছারছীনা * হযরত আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব –পীর ছাহেব হাশেমীয়া দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম * হযরত মাওলানা সালাহ উদ্দিন ছাহেব –খতীব, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা * হযরত মাওলানা আবু বকর ছাহেব –পীর ছাহেব দারুল আমান, কুমিল্লা * ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক ছাহেব –পীর ছাহেব খানকাহ-ই খাস-মোজাদ্দেদীয়া, ঢাকা * হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব –খতীব, গুলশান জামে মসজিদ, ঢাকা * হযরত আল্লামা মোস্তাফা হামিদী ছাহেব –সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাহ আলিয়া মাদরাসা * হযরত আল্লামা মোঃ নজমুদ্দীন ছাহেব –প্রিন্সিপাল, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, সিলেট * হযরত মাওলানা ওসমান গণী ছাহেব –পীর ছাহেব ঠনঠনিয়া, বগুড়া * আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী ছাহেব –মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন * হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোওয়ারুল হক ছাহেব –পীর ছাহেব গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম * অধ্যাপক মাওলানা হাসান আবদুল কাইয়ূম ছাহেব –পীর ছাহেব দ্বারীয়াপুর, যশোর * হযরত মাওলানা ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ শরাফত আলী –অধ্যক্ষ, ছারছীনা আলীয়া মাদরাসা, পিরোজপুর * হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ছাহেব –প্রিন্সিপাল, মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, ঢাকা * হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেব –পীর ছাহেব মাগুরা * হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব –পীর ছাহেব সোনাকান্দা, কুমিল্লা * হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন ছাহেব –পীর ছাহেব মৌকরা, কুমিল্লা * আল্লাম মুফতী মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী –চেয়ারম্যান, দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল-ইসলামী * ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ছাহেব –সাবেক ভিসি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া * হযরত মাওলানা নূরুর রহমান বেগ ছাহেব –খতীব, জামে এবাদুল্লাহ, বরিশাল * হযরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ছাহেব –সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা * হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন আল কাদরী ছাহেব –পীর ছাহেব উমেদনগর গাউছিয়া খানকা, হবিগঞ্জ * হযরত মাওলানা আবূ নছর মুহাম্মদ ফকরুদ্দীন ছাহেব –পীর ছাহেব ডোবরা, ফরীদপুর * হযরত মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন ছাহেব –প্রিন্সিপাল,

নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম * হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক ছাহেব –পীর ছাহেব চিকদাইর, রাউজান, চট্টগ্রাম * হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ছাহেব –পীর ছাহেব আমুরোড, হবিগঞ্জ * হযরত মাওলানা সায়্যিদ সাজিদুল হক ছাহেব –পীর ছাহেব পৈল, হাবেলী, হবিগঞ্জ * সায়্যিদ মুজিবুর রহমান (খছরু মিয়া) ছাহেব –পীর ছাহেব খান্দুরা হাবেলী, বি-বাড়িয়া * হযরত মাওলানা মুফতী শফিকুল ইসলাম ছাহেব –পীর ছাহেব উবাহাটা আজিজিয়া দরবার, হবিগঞ্জ * হযরত মাওলানা শাহ সূফী আহমদ ছাহেব –পীর ছাহেব বাজুকা, কিশোরগঞ্জ * মাওলানা কাজী আলাউদ্দিন আহমদ ছাহেব –পীর ছাহেব সুন্দাদিল, হবিগঞ্জ * হযরত মাওলানা মোঃ যাকারিয়া ছাহেব –পীর ছাহেব আয়েজাবাদ, গাইবান্দা * হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ ছাহেব –পীর ছাহেব শাকপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম * হযরত মাওলানা মোঃ নূর খান ছাহেব –পীর ছাহেব চৈতিয়া, পটুয়াখালী * মাওলানা আবুল কালাম সায়্যিদ উবায়দুর রহমান ছাহেব –পীর ছাহেব ছালেহাবাদ, হবিগঞ্জ, * হযরত মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ ছাহেব –চেয়ারম্যান উলুমুল কুরআন ফাউন্ডেশন * হযরত মাওলানা মুফতী আবূ নছর জিহাদী ছাহেব –রঘুরামপুর, কুমিল্লা * হযরত মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী ছাহেব –প্রিন্সিপাল, নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা * হযরত মাওলানা ড. এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান ছাহেব –প্রিন্সিপাল, ফরিদগন্জ কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর * হযরত মাওলানা আ.খ.ম আবূ বকর সিদ্দীক ছাহেব –প্রিন্সিপাল, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা * হযরত মাওলানা কমরুদ্দীন ছাহেব –প্রিন্সিপাল হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সিলেট * ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ছাহেব –অধ্যাপক, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় * হযরত মাওলানা শফিকুর রহমান ছাহেব –প্রিন্সিপাল, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, সিলেট * হযরত মাওলানা মাশুক আহমদ ছাহেব –প্রিন্সিপাল ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসা, সিলেট * হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম ছাহেব –প্রিন্সিপাল, জকিগঞ্জ ফাজিল সিনিয়র মাদরাসা * আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুস ছালাম ছাহেব –খতিব কাশিয়ানী কোর্ট জামে মসজিদ, গোপালগঞ্জ * হযরত মাওলানা হুছাইন আহমদ ভূঁইয়া –প্রিন্সিপাল, ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, ফেনী * মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান –আহ্বায়ক, বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ ও নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব।

[বি.দ্রঃ এই ঘোষণাপত্রটি ২০১০ সালে বালাকোট সম্মেলন উপলক্ষ্যে গৃহীত হয়। এটি যন্ত্রস্থ হওয়ার পর আরো অনেক উলামা ও মাশায়িখ স্বাক্ষর করেছেন এবং অনেকে স্বাক্ষর দানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্বাক্ষর দানের এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।]

রায় বেরেলীর জঙ্গীপীর

ফররুখ আহমদ

সবাই যখন আরাম খুঁজে ছোটে ঘরের পানে
জঙ্গী পীরের ডাক শোনা যায় জঙ্গেরি ময়দানে।
সবাই ভাবে পীরের কথা শুনেছি তো ঢের
এমন পীরের কথা তো ভাই পাইনি কভু টের।
পাল্কী ছেড়ে পায়দলে বা তাজীতে সওয়ার
তস্‌বি কোথায় হাতে যে তাঁর নাঙ্গা তলোয়ার।
নাই জোব্বার রঙ্গীন বাহার, সাজ-সজ্জা নাই
হাত মেললে বলেন তিনি, 'লড়াই করা চাই'।
বলেন শুধু, 'অন্যায় যা করো ধূলিসাৎ'
পাপ মুলুকে করো কায়েম দ্বীনি হুকুমাত।
ভুঁড়ির বহর বেশি যাদের পালান তাঁরা সব
রুদ্ধ ঘরে আলোচনায় জমান কলরব,
তর্ক ধরেন ধর্ম নিয়ে হন না ঘরের বার
জামাত ভেঙ্গে করেন তাঁরা জিন্দিগী গুজার।
টাকা বাড়ে, ভুঁড়ি বাড়ে- বাড়ে রাতের ঘুম;
পথে পথে কেঁদে মরে মুসলিম ময্‌লুম।
বিদেশ থেকে এল কখন ফিরিঙ্গী ডাকাত
কৌশলে ভাই নিল কেড়ে তাদের হুকুমাৎ।
বন্দী থেকে সেই অবধি খাচ্ছে কেবল মার
শিকল পরা হাতে তাদের নাইকো হাতিয়ার।
রায় বেরেলীর 'আওলিয়া পীর' সৈয়দ আহমদ
খান্দান যাঁর সবার সেরা উচ্চ যাঁহার পদ
মুসলমানের বিপদ দেখে হলেন ঘরের বার
তসবি ছেড়ে হাতে নিলেন নাঙ্গা তলোয়ার।
ভণ্ড যারা পালায় তারা পীরের সুরাত দেখে
সাচ্চা মুমিন পীরের কাছে জিহাদ করা শেখে।
হায়াত-মউত খোদার রাহে যিনি সঁপেন ভাই
এমন পীরের কাছেই শুধু শিক্ষা নেওয়া চাই।
রায় বেরেলীর 'আওলিয়া পীর' মস্ত মুজাদ্দিদ

তাঁর ডাকে ভাই মুসলমানের ভাঙে মরণ নিঁদ।
মুসলমানের জামাত দেখে সবাই করে ভয়
এক জামাতে এলেই তারা করবে জগৎ জয়!
শিখ মুলুকে ছিল রাজা বিষম যুলুমবাজ
মুসলমানের জামাত দেখে তুলিল আওয়াজ।
হল্লা ক'রে দল পাকালো হিংসুটে সব শিখ
রায় বেরেলীর আওলিয়া পীর বিপদে নির্ভীক!
খোদার নামে ঝাণ্ডা তুলে শংকাবিহীন প্রাণে
লক্ষ বীরের সাথে লড়েন জঙ্গেরি ময়দানে।
জিহাদী মেঘ ফাট্‌লো আবার কালবোশেখী ঝড়ে
জঙ্গী পীরের কথায় বুঝি যমীনে বাজ পড়ে।
সামনে লড়াই কঠিন দেখে চালাক শিখের রাজা
ভাবলো তখন পিছন থেকে দেবে কঠিন সাজা।
হামলা করে পিছন থেকে, সামনে যেতে ভয়!
বালাকোটে শহীদ হলেন সেনানী দুর্জয়!
বুকের খুনে গেলেন এঁকে স্বাধীনতার পথ
রায় বেরেলীর জঙ্গী সে পীর নবীর উম্মত।

বালাকোট ডাক দিয়ে যায়
রুহুল আমীন খান

বালাকোট ডাক দিয়ে যায়
তৌহীদের সৈনিকেরা, রাসূলের প্রেমিকেরা
উজ্জীবিত হও পুনঃ ঈমানের বজ্র চেতনায়।

শকুনি মেলেছে ডানা, দিয়েছে ভয়াল হানা
হিংস্র ক্রুর হায়েনার দল
বিষধর গোক্ষুরের দেখো হে স্ফীত ফনা
ভয়ঙ্কর উদ্ধত ছোবল।
চারদিক ঘেরি আসে অতি দ্রুত বাহু অক্টোপাসী
বীভৎস ক্লিন্ন দানো অস্তিত্ব বিনাশী।

বহতা নদীর মতো বয়ে গেছে অমূল্য সময়
হয়েছে অনেক অপচয়।
মজলুমের শোনো আহাজারি
শোণিতাক্ত প্রিয় দেশ
যুদ্ধের ময়দান দেখো দিগন্ত বিসারি।

ওঠো, জাগো, আর দেরি নয়
জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ো
বজ্র কুওয়াত নিয়ে ঈমানের, হিম্মত দুর্জয়।
ভুলে যাও হিংসা লোভ দলাদলি
ক্ষুদ্র স্বার্থ যতো
দাঁড়াও মজবুত হয়ে
অটল অনড় দৃঢ় সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো।
ডাকে ওই বালাকোট
ঈমানের, আমলের, জিহাদের দীক্ষা পুনঃ লও
উম্মার ক্রান্তিকালে মুহাম্মদী তরীকায় ঐক্যবদ্ধ হও।

ডাক দিয়ে যায় শহীদান
জাতির মুমূর্ষু দেহে সঞ্চারিত হয় নব প্রাণ
শাহাদাতী তাজা খুনে। যে জাতি মরিতে জানে
সে জাতি মরে না কোনোদিন
চির দীপ্ত চির অমলিন
অনির্বাণ জেনো সেই শিখা
আজ হোক কাল হোক
অঙ্কিত ললাটদেশে হবে তার বিজয়ের টিকা।

হক প্রতিষ্ঠাই হলো মুমিনের যিন্দেগীর একমাত্র ব্রত
এভারেস্ট শৃঙ্গের মত
সদা উচ্চ শির তার চির সমুন্নত।
সে চির স্বাধীন
উদার উন্মুক্ত নীলে মুক্তপক্ষ দুরন্ত শাহীন।
বহিবার হয় যদি শৃংখলের ভার
তার আগে শাহাদত অভিপ্রেত তামান্না যে তার।
মুমিন প্রস্তুত দিতে রাহেলিল্লা' প্রাণ বিসর্জন
অবশ্যই তার কাছে আকাঙ্ক্ষিত
শৃগাল-শতায়ু থেকে দিনেকের সিংহের জীবন।
সাফল্য-সুবর্ণ দ্বারে উপনীত অমর শহীদ
নিবিড় নৈকট্যে তার অবস্থান মালিকের
যথা নিত্য চিরায়ত ঈদ।
প্রেরণার মহাউৎস সায়্যিদ আহমাদ শহীদ
স্মরণীয় বরণীয় যামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ
অকাতরে বালাকোটে দিয়ে নিজ প্রাণ
দিয়ে গেল গোলামির শৃংখল-মুক্তির সন্ধান।
তরীকত, তাসাউফ মুর্শিদে বরহক কা-কে কয়
দিয়ে গেল সেই পরিচয়।
বালাকোট রণাঙ্গনে শাহাদত-শোণিতে সাঁতারি'
রেখে গেল অনুপম দৃষ্টান্ত–
হোসাইনের উত্তরাধিকারী।

শহীদ মহান

আবদুল মুকীত চৌধুরী

গোল চল্‌ছে ফাঁকা মাঠে
দেশে দেশে আজ পরজীবীদের বিচরণ
মাভৈঃ! নামবে 'জনতন্ত্রের শ্রীচরণ'!
আগ্রাসীকুল অভিনয়রত গণ-মুক্তি পর্বে
বিধ্বংসী এ বিভীষিকার পর্দা কখন পড়বে?

দুষ্কৃতিদের ভাড়ের কলসি জলবিহারে
মাৎস্য ন্যায় বুদ্ধুরা কি বুঝতে পারে?
আপন পায়ে কুড়াল মারছে বেকুবগুলো
শুড়ির সাক্ষী লুণ্ঠন করে চাল ও চুলো।

ওরা ব্যস্ত অষ্টবজ্র সম্মিলনে,
আল্লা'র রজ্জুধারী স্বজন যায় হননে,
এ আক্কেল সেলামী দিয়েই ফতুর হবে
ঘুঘু চরার পালা এখন ভিটেয় তবে।

উড়ে এসে জুড়ে বসতে কে করে মানা?
বিজ্ঞ পিতার সন্তানকুল গো-মূর্খ না!
তবু কবি গায় ফজরের গান ঃ কানে তূলো
তবু ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধায় স্বপ্নগুলো।
সে স্বপ্ন হয় মিছে সোনার পাথর বাটি
উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হলো মাটি।
মনে পড়ে যায় আন্দালুসের নান্দীপাঠে,
হায় রে আল্লা! গোল চল্‌ছে ফাঁকা মাঠে!

رُوحُ بَالَاكُوت

(فِي مدحِ الإمامِ المجاهدِ الشهيد سَيِّد أَحْمَد رَحِمَهُ ٱللَّهُ)

بقلم: محمد مؤمن الإسلام الأزهري

يا سَيِّدَ القَومِ فِي مِضْمَارِ مَكرُمَةٍ،
سَارَتْ بِسِيرَتِكَ الأَنبَاءُ وَالكَلِمُ.

قُمتَ بِالدِّينِ إِذْ مَالَتْ دَعَائِمُهُ،
وَالنَّاسُ فِي ظُلُمَاتِ الجَهلِ تَعتَصِمُ.

نَادَيتَ فِي القَومِ: هَيَّا نُحيِي شَرعَتنَا،
فَالحَقُّ يُطفَأُ وَالأَحزَابُ تَقتَسِمُ.

قُمتَ بِالتَّوحِيدِ تَجلُو كُلَّ غَاشِيَةٍ،
تَحذُو حُدُودَ النَّبِيِّ المُختَارِ تَلتَزِمُ.

قُلتَ: الجِهَادُ سَبِيلُ الحَقِّ نَحمِلُهُ،
وَالمَوتُ فِي اللهِ أَسمَى مَا نَرُومُهُ.

فَانطَلَقَ الجَيشُ كالسَّيلِ العَرِمِ هَدَرًا،
لَا يَرهَبُ السَّيفَ إِنْ نَادَاهُ مَغرَمُهُ.

وَاليَومَ فِي "بَالَاكُوتَ" اسْمُكَ مُتَّقِدٌ،
وَالأَرضُ تَروِي دَمَ الأَبطالِ تُحتَرَمُ.

مَاتَ الجَسَدْ... لَكِنَّ الرُّوحَ صَادِحَةٌ،
فِي كُلِّ جَيلٍ لَهَا وَعدٌ وَمُلْتَزَمُ

আযাদী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার, ঈমানী চেতনার প্রাণপুরুষ, আমীরুল মু'মিনীন, ইমামুত তরীকত, শহীদে বালাকোট

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) স্মরণে

৬ মে, মঙ্গলবার
সকাল ১১টা

সম্মেলন ২০২৫

স্থান ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তন
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

আমন্ত্রিত পীর-মাশায়েখবৃন্দ

- শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা নজমুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী
  ছাহেবজাদায়ে ফুলতলী (র.)
- হযরত মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন
  পীর ছাহেব ছারছীনা
- হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
  পীর ছাহেব, সোনাকান্দা, কুমিল্লা
- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম আবুল কালাম আজাদ
  শাহ মঞ্জিল, চুনতী, চট্টগ্রাম
- হযরত মাওলানা শাহ সূফী আহমদ
  পীর ছাহেব, বাজুকা, কিশোরগঞ্জ
- হযরত মাওলানা মো. আবুল কাশেম
  পীর ছাহেব, কদমচাল, কিশোরগঞ্জ
- হযরত মাওলানা মাহমুদ আহমাদ
  পীর ছাহেব, খানকায়ে ওয়াইসিয়া, যশোর
- হযরত মাওলানা শাহ মাহমুদ সিদ্দিকী আল কুরাইশি
  পীর ছাহেব, দারুল আমান, কুমিল্লা
- হযরত মাওলানা শাহ আবু তাহের মো. নাসের উদ্দিন
  পীর ছাহেব, নূর মোহাম্মদপুর, হবিগঞ্জ
- হযরত মাওলানা মো. আবু বকর ছিদ্দিক আল-কাসেমী
  পীর ছাহেব, বানিয়াপাড়া, কুমিল্লা
- হযরত মাওলানা মুফতি মাহবুবুর রহমান
  পীর ছাহেব, শামসাবাদ, গাজীপুর
- হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম চৌধুরী
  পীর ছাহেব, সিরাজিয়া, ফেনী
- হযরত মাওলানা মো. মাহবুবুর রহমান
  পীর ছাহেব, এখতিয়ারপুর, হবিগঞ্জ
- হযরত মাওলানা কাজী আলাউদ্দিন আহমদ
  পীর ছাহেব, সুন্দাদিল, হবিগঞ্জ

বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

- প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী
  প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
- আলহাজ্ব এএমএম বাহাউদ্দীন
  সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব
- ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
  অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- এডভোকেট মাওলানা মোঃ আব্দুর রকিব
  সভাপতি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
- মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী
  মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন
- ড. মাওলানা সাইয়্যেদ শরাফত আলী
  চেয়ারম্যান, দ্বীনিয়া মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ছারছীনা
- প্রফেসর ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী
  ডীন, থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
- অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার
  সাবেক চেয়ারম্যান, নাক-কান-গলা বিভাগ, পিজি হাসপাতাল
- মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
  প্রিন্সিপাল, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
- জনাব মো. ইসমাঈল মিঞা
  সাবেক জেলা ও দায়রা জজ
- ড. মাওলানা এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান
  সভাপতি, ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন বাংলাদেশ
- ড. মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ
  প্রিন্সিপাল, মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা
- ড. মাওলানা ঈসা শাহেদী
  বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
- মুফতি মাওলানা বদিউল আলম সরকার
  প্রিন্সিপাল, মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদরাসা
- ড. মাওলানা মঈনুল ইসলাম পারভেজ
  প্রিন্সিপাল, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা
- মাওলানা আবু ছালেহ মোঃ কুতবুল আলম
  প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত), হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
- জনাব মাহবুবুর রহমান ফরহাদ
  সভাপতি, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া
- হযরত মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ফকির
  সভাপতি, লতিফিয়া কারী সোসাইটি, কুমিল্লা (উত্তর)

সভাপতি

মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান
আহবায়ক, বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

এছাড়াও সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলার উত্তরসূরী পীর-মাশায়েখ, আলিম-ওলামা, ইসলামী শিক্ষাবিদ-চিন্তাবিদগণ বক্তব্য রাখবেন
এতে আপনাদের উপস্থিতি ও দোয়া কামনা করছি

দাওয়াতক্রমে
আহমদ হাসান চৌধুরী
সদস্য সচিব

বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ